কৃষ্ণ-সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার! যাহা কৃষ্ণ,তাহা নাহি মায়ার অধিকার!!

ভক্তের জীবনে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সেবা। আমাদের হৃদয়কে নির্মল করার জন্য জপ করার আবশ্যকতা আমাদের সমস্ত- পূর্বতন আচার্যগণ অনুমোদন করেছেন। দীক্ষার সময় গুরুদেবের নিকট শিষ্য প্রথমে এই ব্রতই গ্রহন করে। সুতরাং, প্রতিটি নিষ্ঠাবান ভক্তের জন্য নির্ধারিত কমপক্ষে ষোল মালা **'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র'** জপ অবশ্যই খুব মনোযোগ ও নিষ্ঠা সহকারে করা উচিত। আমাদের পারমার্থিক জীবনের শতকরা নিরানব্বই ভাগ অগ্রগতি আসে পবিত্র হরিনাম জপ থেকে। এইভাবে নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্ত অপরাধ শূন্য হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ষোলমালা জপ করলে খুব শীঘ্রই কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি লাভ করবে।

যখন আমরা কোনও কাজে গুরুত্ব আরোপ করি, তখন তার জন্য কিছু সময় আলাদা করে রাখি। সেইরকম, প্রতিটি ভক্তের জপের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সময় যেন জপেই দেওয়া হয়; অন্য কোন কাজের জন্য নয়। **এমনকি তা যদি কোন ধরণের সেবা হয় তাতেও নয়। উদাহরণস্বরূপ, ষোল মালা জপের সময় কোনও কাগজ পড়া, কোন কথা বলা বা কীর্তন শোনা উচিত নয়।** জপ হচ্ছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সেবা, যাতে আমাদের সম্পূর্ণ ও নিরবিচ্ছিন্ন মনোনিবেশের প্রয়োজন হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর

প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দ্বাদশ বর্ষ ▶ তৃতীয় সংখ্যা ▶ জুলাই ▶ আগষ্ট ▶ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (ভারপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ

ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা-
রেজিঃ ডাকে – ১১০.০০ টাকা

গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

❋ যোগাযোগ করুন ❋

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৯১৭৫১৮৮২৭

❀ সূচীপত্র ❀

❊ প্রচ্ছদপট ❊

রথে আরোহণ করে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছে, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হোন।

নীলাচল-নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র-সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ॥

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ঃ ৫২১; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১৪; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৭

৯ই বামন, ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই ২০০৭, সোমবার	ঃ	শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।
১১ই বামন, ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই ২০০৭, বুধবার	ঃ	যোগিনী একাদশীর উপবাস।
১২ই বামন, ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	একাদশীর পারন পূর্বাহ্ন ০৫. ১৯ থেকে ০৯. ৪৯ মি: মধ্যে।
১৪ই বামন, ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই ২০০৭, শনিবার	ঃ	গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
১৫ই বামন, ৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই ২০০৭, রবিবার	ঃ	গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।
১৬ই বামন, ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই ২০০৭, সোমবার	ঃ	ভগবান শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব ও শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব।
২০শে বামন, ৩রা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	শ্রী হেরা পঞ্চমী। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।
২৪শে বামন, ৭ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	উল্টো রথযাত্রা।
২৬শে বামন, ৯ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	শয়ন একাদশীর উপবাস।
২৭শে বামন, ১০ই শ্রাবণ, ২৭শে জুলাই ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	একাদশীর পারণ, পূর্বাহ্ন ০৫.২৬ মি: থেকে ০৮.০৫ মি: মধ্যে।
৩০শে বামন, ১৩ই শ্রবণ, ৩০শে জুলাই ২০০৭, সোমবার	ঃ	গুরু (ব্যাস পূর্ণিমা), শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। চাতুর্মাস্যের ১ম মাস শুরু (এক মাসের জন্য শাক বর্জন)
১০ই শ্রীধর, ২৩শে শ্রাবণ, ৯ই আগস্ট ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	কামিকা একাদশীর উপবাস।
১১ই শ্রীধর, ২৪শে শ্রাবণ, ১০ আগস্ট ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	একাদশীর পারন, পূর্বাহ্ন ০৫.৩২ মি: থেকে ০৭.০০ মি: মধ্যে।
২৫শে শ্রীধর, ৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগস্ট ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	পবিত্রারোপিনী একাদশীর উপবাস। শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের ঝুলযাত্রা আরম্ভ।
২৬শে শ্রীধর, ৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগস্ট ২০০৭, শনিবার	ঃ	একাদশীর পারন, পূর্বাহ্ন ০৫.৩৮ মি: থেকে ০৯.৫৩ মি: মধ্যে।
২৯শে শ্রীধর, ১১ই ভাদ্র, ২৮শে আগস্ট ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। ভগবান শ্রী বলরামের আবির্ভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস) চাতুর্মাস্যের ২য় মাস আরম্ভ (এক মাস দধি বর্জন)
৭ই হৃষীকেশ, ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (আবির্ভাব) জন্মাষ্টমী। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নির্জলা উপবাস। পরে অনুকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
৮ই হৃষীকেশ, ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৭, বুধবার	ঃ	শ্রী নন্দোৎসব। শ্রীল অভয়চরনারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
১০ই হৃষীকেশ, ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৭, শুক্রবার	ঃ	অন্নদা একাদশীর উপবাস।
১১ই হৃষীকেশ, ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৭, শনিবার	ঃ	একাদশীর পারন, পূর্বাহ্ন ০৫.৪২ মি: থেকে ০৯.৫২ মি: মধ্যে।
১৯শে হৃষীকেশ, ৩০শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭, রবিবার	ঃ	শ্রী অদ্বৈত পত্নী সীতা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব।
২০শে হৃষীকেশ, ৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭, সোমবার	ঃ	শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব।
২৩শে হৃষীকেশ, ৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭, বৃহস্পতিবার	ঃ	শ্রীমতি রাধারাণীর আবির্ভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
২৬শে হৃষীকেশ, ৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭, রবিবার	ঃ	পার্শ্ব একাদশীর উপবাস।
২৭শে হৃষীকেশ, ৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭, সোমবার	ঃ	একাদশীর পারন, পূর্বাহ্ন ০৫.৪৮ থেকে ০৯.৫০ মি: মধ্যে। ভগবান শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব।
২৮শে হৃষীকেশ, ৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭, মঙ্গলবার	ঃ	শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)
২৯শে হৃষীকেশ, ৯ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭, বুধবার	ঃ	বিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণ। চাতুর্মাস্যের ৩য় মাস শুরু (এক মাস দুধ বর্জন)
৭ই পদ্মনাভ, ১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, ২০০৭, বুধবার	ঃ	শ্রীল প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব।

অদৃশ্য নিয়ন্তা

– শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ-কামহৈতুকম্॥

"অসুরেরা বলে যে এই জগৎ অসত্য, এর কোন আশ্রয় নেই এবং এর নিয়ন্তা কোন ঈশ্বর নেই– কামের প্রভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে, এবং কাম ছাড়া এর আর কোন হেতু নেই।"

(ভগবদ্গীতা ১৬/৮)

এটাই হচ্ছে আসুরিক মতবাদ, অসত্যম্ : তারা বলে যে, এই জড়জগৎ অসত্য। জগৎ মিথ্যা। জগৎ মানে হচ্ছে এই জড়াপ্রকৃতি- তাকে অসুরেরা মিথ্যা বলে, কেননা তা গতিশীল, তা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এটা সত্য যে, জড়জগতে সবকিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে– ঠিক যেমন আপনারা দেখতে পান যে, গাড়ীগুলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে চলেছে। সর্বক্ষণ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। এই জড়জগতও তেমন গতিশীল – পরিবর্তনশীল। প্রতিটি গ্রহ তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। এমনি সূর্যও তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। সেই কক্ষপথে লক্ষ লক্ষ মাইল বেগে সূর্য ছুটে চলেছে। তাই এই প্রকৃতিকে বলা হয় জগৎ - **'গচ্ছতি ইতি জগৎ'**- এই ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই গতিশীল বা পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার গতি বা পরিবর্তন কোন বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। যেমন, আমাদের ঘরের বাইরে রাস্তায় গাড়ীগুলি প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে, কিন্তু তারা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে কোন বিশেষ পথ ধরে চলছে; তা না হলে অন্য গাড়ীর সাথে ধাক্কা লাগবে, দূর্ঘটনা ঘটবে। তেমনই এই সমস্ত গ্রহগুলি তাদের স্বীয় কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে, আর এরকম লক্ষ কোটি গ্রহ রয়েছে – তারা তাদের কক্ষপথে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে কিন্তু কোনও দূর্ঘটনা ঘটছে না। এটি কি করে সম্ভব হচ্ছে? ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত পথগুলি কে তৈরী করেছে?

এখানে গাড়ীগুলি ৬০ অথবা ৭০ মাইল বেগে চলছে, এবং নির্দেশ দেওয়া আছে, যে লাইনটানা পথগুলি ধরে তারা যাবে। এই বন্দোবস্ত কে করেছে? পুলিশ বিভাগ করেছে, সরকার করেছে। সুতরাং আপনি যদি বলেন, এই গাড়ীগুলির চলাচল কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাহলে সেটা আপনার নির্বুদ্ধিতা। এটি একটি 'উপমা'। 'উপমা' কথাটির অর্থ হচ্ছে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ঠিক যেমন আপনি দেখছেন যে, রাস্তায় গাড়ীগুলি দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, কিন্তু তারা তাদের কক্ষপথে (সাদা আর হলুদ লাইন টানা পথে) চলছে, কেননা কোন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বিভাগ, কোন কর্তৃপক্ষ এইভাবে গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। তেমনই সমস্ত গ্রহগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে তারা পরিচালিত হচ্ছে।

যেমন, এই পৃথিবীর কথাই ধরুন; এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। তাই নয় কি? একটা গাড়ী ৭০ মাইল বেগে যখন চলে, তখন আমরা মনে করি সেটা কত জোরে চলছে,

কিন্তু এই পৃথিবী তার থেকে অনেক অনেক দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। এত সুন্দর ভাবে সবকিছুর আয়োজন করা হয়েছে যে, আমাদের মনে হচ্ছে, যেন আমরা এক জায়গায় বসে আছি। আমরা যখন দেখি যে, সকাল হচ্ছে, তারপর দুপুর হচ্ছে- তখন আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এরোপ্লেনও চলে – কিন্তু তাতে কত ঝাঁকানি হয়, কত শব্দ হয়। এরোপ্লেনগুলি নিখুঁত নয়। কিন্তু প্রকৃতিতে আমরা দেখছি কত নিখুঁতভাবে সবকিছুর আয়োজন করা হয়েছে। পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে ছুটে চলছে, কিন্তু তবুও তাতে কোন ঝাঁকানি নেই, কোন শব্দ নেই– আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমরা এক জায়গাতেই বসে আছি। কিন্তু তবুও আপনারা বলেন যে, এই নিয়ন্ত্রণের পেছনে কোন বুদ্ধিমান সত্তা নেই?

এই গ্রহে রাস্তা দিয়ে গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় – পুলিশের কত আয়োজন, কত সরকারী বন্দোবস্ত, কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কত কিছু রয়েছে। আর ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি গ্রহই নয়, কোটি কোটি গ্রহ রয়েছে। **'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি'**। এখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি গ্রহের আবহাওয়া ভিন্ন ধরনের। এমন নয় যে, প্রতিটি গ্রহই একরকম। আপনারা দেখবেন যে, বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন আবহাওয়া রয়েছে। যেমন, সূর্য হচ্ছে একটি আগ্নেয় গ্রহ, তার তাপমাত্রা এত প্রখর যে, নয় কোটি ত্রিশ

লক্ষ মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও সূর্যের প্রচণ্ড দহন আমরা অনুভব করতে পারি। তেমনই আবার চন্দ্র হচ্ছে অত্যন্ত শীতল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন আবহাওয়া রয়েছে এবং তারা সকলেই তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে এবং সেজন্য নিশ্চয়ই একটা উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখন, আমরা যদি এই অতি উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দেখা সত্ত্বেও বলি যে, তার পিছনে কোন নিয়ন্তা নেই, তাহলে সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কথা হল?

রাক্ষস এবং অসুরেরা বলে, **'অসত্যং অপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুর অনিশ্বরম্'**— "এর কোন নিয়ন্তা নেই এবং তা অসত্য।" অসত্য? এত নিখুঁতভাবে সমস্ত আইন-কানুনগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে। সূর্য এত নিখুঁতভাবে তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে যে, সূর্য যদি একদিকে একটু হেলে পড়ে তাহলে এই পৃথিবীটা নিমেষের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যাবে অথবা জমে বরফ হয়ে যাবে। সে কথা বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করে। সুতরাং সূর্য নিশ্চয়ই কোন নিয়ন্তার পরিকল্পনা অনুসারে চলছে। সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম সংহিতাতেও বলা হয়েছে, **'যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত কালচক্রো।'** পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে সূর্য তার কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। আজ্ঞা মানে হচ্ছে, আদেশ। যখনই আদেশের প্রশ্ন ওঠে তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তাহলে আদেশ প্রদানকারী নিশ্চয়ই কেউ রয়েছেন। তা না হলে আদেশের কি অর্থ হল? **'যস্য আজ্ঞয়া'** মানে হচ্ছে, যার আদেশে। অর্থাৎ সূর্যের থেকেও মহৎ কেউ যিনি সূর্যকে আদেশ দিচ্ছেন এবং সূর্য তাঁর সে আদেশ পালন করছে। সুতরাং আদেশ দাতা একজন নিশ্চয়ই রয়েছেন, তাহলে কিভাবে আপনারা বলেন যে কোন নিয়ন্তা নেই। সে সম্বন্ধে আপনাদের কি যুক্তি রয়েছে? আপনারা যে বলেন, যে কোন নিয়ন্তা নেই সে সম্বন্ধে আপনারা কি কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন? অসুরেরা বলে যে ভগবান নেই, কোন নিয়ন্তা নেই – কিন্তু তাদের যুক্তি কি? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, "আপনারা সে কথা কিভাবে বলেন? সে সম্বন্ধে আপনার যুক্তি কি? আপনারা যে বলেন ভগবান নেই, কোন্ যুক্তির প্রভাবে আপনারা সে কথা বলেন? আসুন, সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি।"

এখানে আমি একজন বিদেশী হতে পারি, কিন্তু আমি যখন দেখি যে রাস্তায় গাড়ীগুলি অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে, এবং পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, তখন আমি বুঝতে পারি যে এই দেশে নিশ্চয়ই একটি সরকার রয়েছে। আমি তা জানতে পারি বা না জানতে পারি, কিন্তু এটা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান। তেমনই আমি যখন দেখি এই জগতে সবকিছুই অত্যন্ত সুন্দরভাবে, সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে তখন আমি কিভাবে বলতে পারি যে, তার পেছনে কোন নিয়ন্তা নেই? সেটা তাহলে কি ধরনের যুক্তি হবে? বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, কোন নিয়ন্তা নেই; ঈশ্বর নেই; **'জগদাহুরনিশ্বরম্'**। কিন্তু তাদের যুক্তি কি?

একটি নির্বোধ শিশুই কেবল বলবে, "সবকিছু ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে।" সেটি একটি নির্বোধ শিশুর কথা। কিন্তু আপনি যদি সে কথা বলেন তাহলে আপনাকে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে। যে কোন কিছুর সম্বন্ধেই আপনি বলতে পারেন, "ঘটনাক্রমে এর সৃষ্টি হয়েছে।" যে কেউ সে কথা বলতে পারে, কিন্তু সেটা যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি যখন "ঘটনাক্রমে" কথাটির উল্লেখ করেন তখনই সেটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন হয়ে যায়। কেউ যদি বলে, "ঘটনাক্রমে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি," সেটি কোন যুক্তি নয়। আপনার নিশ্চয়ই একজন পিতা আছে, নিশ্চয়ই একজন মাতা আছে, এবং আপনার পিতা এবং মাতার মিলনের ফলে আপনার জন্ম হয়েছে। এটি হচ্ছে বিজ্ঞান। 'ঘটনাক্রমে আমি আকাশ থেকে এখানে পড়েছি' এটি কোন যুক্তিপূর্ণ উক্তি নয় – এ ধরনের যুক্তির কোন মূল্য কি আপনি দেন?কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ 'ঘটনাক্রমে' কথাটি মেনে নেবে না।

আপনি যদি কোন অপরাধ করার ফলে দণ্ড ভোগ করেন তখন কি আপনি বলতে পারেন, "ঘটনাক্রমে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দণ্ড ভোগ করছি।" "ঘটনাক্রমে" না। আপনি যদি চুরি করেন তাহলে পুলিশ এসে আপনাকে ধরবে এবং বিচারক আপনাকে দণ্ড দেবে। এই দণ্ড আপনাকে ভোগ করতেই হবে। এটি "ঘটনাক্রমে" নয়, ঘটনাক্রমের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। সেটা একটা অযৌক্তিক যুক্তি। ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটে না – সেটিই হচ্ছে যথার্থ যুক্তি। "ঘটনাক্রমে" মানে হচ্ছে অজ্ঞতা, যে জানে না সে-ই বলে "ঘটনাক্রমে"। এটি জ্ঞান নয়, অজ্ঞান।

এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে এক- একটি নির্বোধ, মূর্খ। তাদের যে সমস্ত যুক্তি - "আমি ভগবানকে দেখিনি তাই আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি না", "সবকিছুই ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়েছে", "ঘটনাক্রমে প্রকৃতির উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে ...... এগুলি সমস্ত অর্থহীন প্রস্তাব। কারও নিয়ন্ত্রণের ফলে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এটাই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। ঠিক যেমন টোকিও শহরের সব বন্দোবস্ত দেখে আপনি সহজেই বুঝতে পারেন যে এখানে একটি সরকার রয়েছে, তেমনই আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব সুন্দর সমস্ত বন্দোবস্তের পিছনে একজন পরম নিয়ন্তা নিশ্চয়ই রয়েছেন। সেটিই হচ্ছে আস্তিক্যবাদ, সেটিই হচ্ছে জ্ঞান।

এই সমস্ত মূর্খ তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। তারা বলে, "আমাদের এই বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন সময় দিন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি যথার্থ জ্ঞানী হন, ঐকান্তিকভাবে কেউ যদি প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, তাহলে একসময় তিনি জানতে পারবেন যে ভগবান আছেন। **'বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'** তখন তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর মানুষে পরিণত হবেন, 'মহাত্মায় পরিণত হবেন। কিন্তু সে-ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে দুরাত্মা; তারা বিকৃত মনোবৃত্তি সম্পন্ন। তারা বলে, অনীশ্বরম্ – "কোন নিয়ন্তা নেই, ঈশ্বর নেই; এই জগৎ মিথ্যা।" এই জগৎ মিথ্যা নয়। আপনি সমস্ত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন – একটা পাতার কথাই ধরুন – তাতে কি সুন্দর বন্দোবস্ত রয়েছে, কত সূক্ষ্ম শিরা-

উপশিরা রয়েছে এবং তারা কত নিপুণভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে। একটা ক্ষুদ্র পাতা বা একটা ছোট ফলে কি অপূর্ব দক্ষতার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন যে, "ঘটনাক্রমে" এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। সেটা আপনি বলতে পারেন না। এই জড় সৃষ্টির পিছনে অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কেউ রয়েছেন। আর সেই বুদ্ধিমত্তার উর্ধ্বে আরও উন্নত বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তার উর্ধ্বে আরও উন্নত বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তারও উর্ধ্বে তারও উর্ধ্বে তারও উর্ধ্বে – **বহু জন্মনাম্ অন্তেঃ** সেই পরম বুদ্ধিমান সত্তাকে খুঁজতে গিয়ে বহু বহু জন্মের পরে আমরা বুঝতে পারি যে, '**বাসুদেব সর্বমিতি**'। আমরা তখন বুঝতে পারি যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। সেই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসংহিতায় করা হয়েছে : 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' – পরম ঈশ্বর হচ্ছেন কৃষ্ণ।

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

অধীন, নিয়ন্তা অনেক রয়েছে। যেমন এই শহর পরিচালিত হচ্ছে পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। কিন্তু তার উপরে কেউ রয়েছে, তারও উপরে কেউ রয়েছে এবং তারও উপরে কোন নিয়ন্তা রয়েছে – এবং সবার উপরে রয়েছেন পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ। সেটাই হচ্ছে বেদের সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং তাঁর রূপ- সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। কৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, এবং তিনি একলা নন। তাঁর অনন্ত শক্তি রয়েছে।

আমার মত একজন সাধারণ মানুষ – ভক্তিবেদান্ত স্বামী – আমি একলা নই। আমার অনেক সহকারী রয়েছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অনেক সহকারী রয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার কথা যদি আপনারা বিবেচনা করেন, তিনি একলা নন। আমি যেমন আমার শিষ্যদের মাধ্যমে বহু জায়গায়, বহুভাবে নিজেকে বিস্তার করেছি, তাহলে আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখুন কৃষ্ণ কিভাবে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন – সেটা আপনারা শুধু একটু বিবেচনা করে দেখুন। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। '**অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিমনন্ত রূপম্।**' অনন্তরূপম্ – যদিও তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ, তিনি অনন্ত রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। আর সেইভাবেই তিনি সবকিছু করছেন। আমি যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমার সমস্ত সহকারীদের নির্দেশ দিচ্ছি এবং তারা আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করছে, কৃষ্ণও তেমন তাঁর অনন্ত রূপের মাধ্যমে অনন্ত সহকারীদের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করছেন। '**পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে**'– পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। সে কথা আপনাদের বুঝতে হবে। তিনি এক হলেও বহুরূপে, অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই পরিচালিত করছেন। **ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি**। অনন্ত কোটি জীব রয়েছে, এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তিনি তাদের জ্ঞান, স্মৃতি এবং বিস্মৃতি দান করছেন। এইভাবে তিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন। আমরা যদি মনে করি যে, তিনি আমাদের মত একজন পরিচালক, তাহলে সেটা আমাদের ভুল হবে। তিনি পরিচালনা করেন অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সহকারী এবং অনন্ত শক্তির সাহায্যে।

এই সমস্ত নাস্তিকেরা, বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না যে, কিভাবে একজন এরকম অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হতে পারে। তাই তারা নির্বিশেষবাদী হয়ে যায়। তারা অনুমান করে, "সেই নিয়ন্তা যদি একজন ব্যক্তি হয়, তাহলে তিনি আমার মত একজন ব্যক্তি। আমি এটা করতে পারি না। তাই তিনিও এটা করতে পারবেন না।" তাই ভগবদ্গীতায় তাদের মূঢ় বলে সম্বোধন করা হয়েছে। '**অবজানান্তি মাং মূঢ়াঃ**' এই সমস্ত নির্বোধ মূর্খগুলি কৃষ্ণকে জানতে পারে না, কেননা তারা তাদের সঙ্গে কৃষ্ণের তুলনা করে, তারা মনে করে যে কৃষ্ণও তাদের মত একজন মানুষ। বেদে বলা হয়েছে যদিও তিনি একজন সবিশেষ পুরুষ, কিন্তু তিনি অনন্ত কোটি জীবকে পরিচালনা করছেন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী বৈজ্ঞানিকেরা সে কথা জানে না – '**একো বহুনাং যো বিদধাতু কামান**' – একজন পুরুষ তিনি অনন্তকোটি জীবকে পরিচালনা করছেন।

আমরা সকলেই হচ্ছি– এক-একজন ব্যক্তি, আমি একজন ব্যক্তি, আপনি একজন ব্যক্তি, কীট-পতঙ্গগুলিও হচ্ছে এক-একটি ব্যক্তি, একটি গাছ একটি ব্যক্তি। আরেকজন ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান, কৃষ্ণ। '**নিত্য নিত্যানাং চেতন-শ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতুকামান্**' (কঠোপনিষদ): একজন ব্যক্তি অনন্তকোটি জীবকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেটি হচ্ছে বৈদিক তথ্য। আর কৃষ্ণও ভগবদ্গীতায় বলেছেন : (১০/৮), "**অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং প্রবর্ততে**" "আমি হচ্ছি সবকিছুর উৎস; আমাকে আশ্রয় করেই সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে।" তাই কেউ যখন যথাযথভাবে বুঝতে পারে যে, "এই পরম ঈশ্বর হচ্ছেন পরম নায়ক, তিনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, তিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরিচালক", তখন সে শ্রদ্ধাভরে তাঁর শরণাগত হয়, তাঁর ভক্ত হয়।

আমরা, কৃষ্ণভক্তরা মূর্খ বা নির্বোধ নই। আমাদের যুক্তি রয়েছে। আমাদের দর্শন রয়েছে। আমরা যখন জানতে পারি যে, কৃষ্ণই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর, পরম পুরুষ, পরম নিয়ন্তা – তখন আমরা তাঁর শরণাগত হই। তখন আমরা তাঁর ভক্ত হই। এটি অন্ধ বিশ্বাস নয়। আমরা সর্বতোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এই পুরুষই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাই আমরা তাঁর শরণাগত হয়েছি। আমরা অন্ধ অনুগামী নই।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্ত সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবঃসমন্বিতা ॥ (গীতা ১০/৮)

কৃষ্ণ বলেছেন, "আমিই উৎস; আমার থেকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। কেউ যখন আমার ভক্ত হয় তখন সে তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে।" 'বুধা' কথাটির অর্থ হচ্ছে যিনি যথাযথভাবে বুঝতে পারেন।

আসুরিক বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ হচ্ছে 'অপরস্পর সম্ভূতম্'– সবকিছুরই প্রকাশ হয়েছে যান্ত্রিক আকর্ষণের ফলে। 'কিমন্যৎ কামহৈতুকম্'। কাম মানে হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কামার্ত হয়ে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হয় এবং তার ফলে সন্তানের জন্ম হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে এই ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি যান্ত্রিক আকর্ষণের ফলে, কামের প্রভাবে, ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে– এর পেছনে কোন পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তারা জানে না যে, এই প্রকৃতিতে সবকিছুর পিছনেই একটা মহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। আর সেই পরিকল্পনার একটি অংশ হচ্ছে...

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

(ভগবদ্গীতা ৪/৭)

"যখনই ধর্মের গ্লানি হয় বা ধর্মের অবনতি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।" সেটাই হচ্ছে পরিকল্পনা।

এই সমস্ত মূর্খগুলি– এই সমস্ত নাস্তিকগুলি বলে, 'কিমন্যাৎ কামহৈতুকম্'; "কামই হচ্ছে একমাত্র হেতু, এবং এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একমাত্র কারণ।' "আমাদের কাম-ক্রীড়ার ফলে একটি সন্তানের জন্ম হতে চলেছে, কিন্তু তার ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আমরা চাই না। সুতরাং তাকে মেরে ফেল। তাতে ক্ষতি কি?" তাই তারা ভ্রূন হত্যা করছে – মাতৃজঠরে শিশুহত্যা করছে – এবং সেটাকে আইনসঙ্গত ভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের ফলে একটি সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু তারা তাকে চায় না, তাই তারা বলে, 'তাকে মেরে ফেল।" এইভাবে মা তার গর্ভে নিজের সন্তানকে হত্যা করছে; এটাই হচ্ছে নাস্তিকতার পরিণতি।

এগুলি হচ্ছে সমস্ত নির্বোধ মতবাদ – "ঘটনাক্রমে," "অহৈতুকী কামের প্রভাব।" না! সবকিছুর পিছনেই একটা মহৎ বন্দোবস্ত রয়েছে। এটা রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মত – এর পেছনে একটা মস্ত বড় আয়োজন রয়েছে। ঘটনাক্রমে তা হয়নি। আমরা কি ঘটনাক্রমে গাড়ী চলার এই রাস্তাগুলি পেয়েছি? না, ঘটনাক্রমে তা হয়নি। সুতরাং আপনারা কিভাবে বলেন "ঘটনাক্রমে সবকিছু ঘটছে?" অসুরেরা এই সমস্ত মতবাদ সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত আসুরিক মতবাদগুলি আমাদের কোনভাবে সাহায্য করবে না। এই সমস্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলে আমরা চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারেই পড়ে থাকব, জ্ঞান লাভ করতে পারব না।

(৯ পৃষ্ঠার পর)

গাধা বোঝে না অতি অনায়াসেই চারিদিকে কত ঘাস পাওয়া যেতে পারে। তাই তো অজ্ঞতার বশে ধোপার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে থাকে। আর একটি বৈদিক শাস্ত্রীয় উপমায়-যে সব মানুষ শুধুমাত্র অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে এবং অবৈধ যৌন চর্চা করে জীবনকে অপব্যবহার করে থাকে, তাদেরকে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ সকল ভারতের গ্রামে-গঞ্জে বেশি দেখা যায়–যদিও তা বিরক্তিকর। এ সব উপমা নিছক রূপক হিসাবেই রাখা হয়নি। জন্মান্তরবাদের নিয়মে মানুষ যখন তার মনুষ্য জীবনকে পশুর মতো অপব্যবহার করে, পরজন্মে সে পশুরূপেই জন্মলাভ করে থাকে, যাতে শুয়োর বা গাধার মতো তার আচরণ চর্চায় সুবিধা হতে পারে।

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যখন তমোগুণ কোন মানুষকে আচ্ছন্ন করে, তখন অজ্ঞতা; অকর্মণ্যতা, তমসাচ্ছন্নতা এবং ভ্রম তার আচরণে প্রতিফলিত হয়। এই রকম আচরণ মদ্যপ, নেশাসক্ত, অকর্মণ্য মানুষের মাঝেই দেখা যায়, যারা সাধারণত নির্বুদ্ধিতাকেই আশ্রয় করে থাকে। ঠিক সেইরকমই একজন কামাসক্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দ্বারাই কালাতিপাত করতে দেখা যায়। উদাহরণগুলো থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আবেগপ্রবণ মানুষ যদিও সাময়িকভাবে জীবনে সাফল্য অর্জন করে থাকে, তাদের জীবনেও ত্রিগুণের কুফল প্রতিফলিত হবেই। সেই কারণেই বলা হয়েছে, যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানের আলোয় শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে পেরেছেন, তাঁরাই একমাত্র ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করতে পারেন।

এই পারমার্থিক চেতনার শুদ্ধ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবন ও পৃথিবীকে দেখা নিছক খেলা নয়, বরং এ হল জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপ্ত করা বা উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের অন্যতম পদ্ধতি। শাস্ত্র চেতনা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে যাতে আত্মার অবনতি ঘটিয়েও জড় জাগতিক জীবনের সম্পদ সঞ্চয় এবং নারীর বাহ্যিক রূপ লাবণ্যের প্রতি আকর্ষণের নির্বুদ্ধিতা আমাদের গ্রাস না করতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করার পরে আমরা জড়জাগতিক পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপের সম্মুখীন হতে পারি, ভ্রান্ত এবং সত্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি এবং এই বিশ্বপ্রকৃতি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান শক্তির অন্যতম অংশ সেই মর্মার্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির চরম উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখা। এই ভগবদ্‌প্রেম তখনই আমাদের মাঝে আসে, যখন আমরা তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিভরে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করতে পারি।

ভক্তগণ প্রতিদিন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে আমন্ত্রণ জানিয়ে, কৃষ্ণ ভজন শুনিয়ে আমাদের ভগবৎ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জড় জগতের মাঝে অপার্থিব শক্তির অস্তিত্বের এটাই অকাট্য প্রমাণ। শাস্ত্রাদির মাধ্যমে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্তি চর্চায় নিয়োজিত থাকলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন-ই হৃদয়ে আশ্রয় নিয়ে সেই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করে দেন, যা দিয়ে আমরা সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব দর্শন করতে পারি, সেই মানসিকতা তিনিই কৃপাভরে অর্পণ করেন, যা দিয়ে তাঁর শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যে আমাকে সর্বত্র দেখতে পেয়েছে এবং আমার মাঝেই সব কিছুকে খুঁজে পেয়েছে, আমি তাকে কোনদিন পরিত্যাগ করতে পারি না, সেও আমা হতে নিবৃত্ত হতে পারে না।"

অনুবাদ : ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান

– শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলবার্ট হলে "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকার" শীর্ষক একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছেন। তা গত বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী' পরিত্রকায় মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের হস্তগত হয়েছে। তা পাঠে আমরা যেরূপভাবে উপনীত হয়েছি, অদ্য লেখক বা পাঠকবর্গকে তা জানাইতে ইচ্ছা করি। ফুলে মধু জন্মে, ভ্রমর তাহা প্রকাশ করে; আবার বিষও জন্মে, লুতাকীট তা প্রকাশ করে দেয়। হয়তো সংসারে বিষের সংমিশ্রণ ভিন্ন কেবল মধুর স্থান নেই। লুতাকীটেরও জনসমাজে একটী স্থান আছে, নচেৎ কেবল মধুর উদ্ধার হয় না।

অবশ্য লুতাকীটের অপেক্ষা সংসারে ভ্রমরের আদর অধিক; কারণ; সাধারণে ভ্রমরের নিকটেই মধু প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভ্রমরের নিকট লুতাকীটের অনাদর নাই। কারণ লুতাকীটের সাহায্যে ভ্রমরকে মধু-সংগ্রহে অধিক আয়াস স্বীকার করতে হয় না।

অতএব লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নয়। না হলেও মধ্যে মধ্যে উহাদের বিবাদ ঘটে। কারণ, মধুরূপ মাদকে ভ্রমরের সময়ে সময়ে যে উন্মত্ততা হয়, তা ভ্রমর না বুঝতে পারে; কিন্তু লুতাকীট বুঝে,– বুঝে বলিয়াই সে মধু আহরণে ভ্রমরকে বাধা দেয়। কিন্তু লুতাকীটের সে অপেক্ষা নয়। কারণ, বিষ ভোগের নয়,– ত্যাগের। সাবধানে বিষ ত্যাগ করাই লুতাকীটের কার্য্য। এজন্য লুতাকীটের বুদ্ধি উন্মত্তভাবাপন্ন হয় না।

বস্তুমাত্রেই মিষ্টতার অংশ আছে। তবে কম আর বেশী। অম্লেও মিষ্টতা আছে। যেখানে সেই মিষ্টতার সারাংশ সহজে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর সেই স্থানেই গমনাগমন করে। মিষ্টতারও ইতর-বিশেষ আছে, জাগতিক বস্তুমাত্রই জড়রসে ভাবিত। তবে যেখানে যে রসের প্রাধান্য, তদনুসারেই নামকরণ হয়। এই হিসাবে মিষ্টতারও ভেদ নির্দ্দেশ হয়।

খায়তো সকলেই; কিন্তু এই মিষ্টতার সূক্ষ্ম ভেদ নির্দ্দেশ করবার লোক কয়জন মিলে? অনেক সময় শর্করাকে অনেকে মিশ্রি বলে থাকেন। ধনবানের গৃহে মিশ্রির সরবত পান না করতে পেরে বা দ্বারের বহিঃপ্রাঙ্গণ হতে ঐ স্থান শর্করা-বর্জ্জিত শুনে ধনবানের গৃহ মিষ্টতাবর্জ্জিত,– এইরূপ সিদ্ধান্ত করে তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বক্তৃতাও করেন। এ বক্তৃতা নিজেকেই আত্মবঞ্চক করে তুলে। শর্করা এবং মিশ্রি এক বস্তু হলেও একটী মলিনাংশযুক্ত এবং অপরটী মলিনাংশ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ জ্ঞান এবং সম্বিৎ একবস্তু হলেও, যাহা রজস্তম-মিশ্রিত, তাই জড়জ্ঞান এবং যাহা রজস্তম-বর্জ্জিত, তাই সম্বিৎ। অতএব বৈষ্ণব জ্ঞানকে দূরে রেখে সম্বিৎকে পূজা করেন বলে তাকে "অভিভাবক-শূন্য" রূপে নির্দ্দেশ করা উচিত নয়।

যা দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞেয় উপলব্ধি, তাই জ্ঞান বা সম্বিৎ। সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিদ্বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, জ্ঞান রজস্তম অতিক্রম করতে না পারলে তার পক্ষে চিজ্জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। সেই জ্ঞান যে

নামেই অভিহিত হোক না কেন, তাহা জড়সীমা অতিক্রম করতে পারে না। "তুমি ব্রহ্মই বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎকে অলীক বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎকে অলীক বল, সেও একই কথা।" কারণ, তোমার সবই মৌখিকতা, কাজে যে তুমি, সেই তুমি। আত্ম-প্রত্যয় তাতে হবে না। জড়সীমার অতীত না হইলে জড়তত্ত্ব নির্ণীত হবার নয়।

ঈশ্বর–বিভু; জীব–অণু। অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাই ভক্তি। সে আকর্ষণ জীবের নিত্যসহচর হলেও জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দ্দম-লেপিত লৌহের ন্যায় অয়স্কান্তের আকর্ষণ হতে বিচ্যুত। জীব ভক্তির আকর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত-রজস্তমগুণ বিচ্ছিন্ন করে পরসত্ত্বে নীত হয়। তখন সত্ত্ব-মার্জ্জিত লৌহের ন্যায় আপাত জ্ঞান ও মায়িক আনন্দের আবরণমুক্ত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বিভু স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই স্বরূপ-শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে তিনি সৎ-স্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎ-স্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তাঁর লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধান। সন্ধিনীর শুদ্ধশক্তির বিলাসরূপ প্রেমবৃত্তিতে সম্বিৎ অপেক্ষা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য-ভাব হলেও সম্বিৎ 'শূন্য' নয়। মায়িক প্রকৃতিও সর্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণ-রূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ 'শূন্য' হতে পারে না।

সেই শক্তিই প্রেমস্বরূপ। তবে যে তাঁর গাঢ় অবস্থাকে প্রেমরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তার কারণ, পৌর্ণমাসীর ন্যায় ভক্তি নিত্য-পূর্ণ-প্রেমস্বরূপ হলেও তার কলা নির্দেশে ভক্তি, ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। প্রেম নিত্য-আবরণশূন্যস্বরূপ; যখন শুদ্ধ-সত্ত্ব-রজস্তম আবরণে আবৃত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হয়ে চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ত্যাগ করে মায়িক বিলাসে ক্রিয়া করতে থাকে, তাই মায়িক কামরূপে নির্দিষ্ট। এই কামেরই বিলাস-কলা-বিশেষ মায়িক-ভক্তি। **বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে কিন্তু যা এই মায়িক কামগত, তা বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত। কারণ, তাহা পরা ভক্তি নয়। পরা ভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়।** অর্থাৎ, বৈষ্ণব যেমন রজস্তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎরূপ আপাত-জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তেমনি ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জ্জন করেন। অতএব লেখকের বুঝা উচিত, বৈষ্ণব যেরূপ মায়িক জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তদনুরূপ মায়িক-প্রেমকেও (?) বর্জ্জন করেন যিনি অন্তর্মুখী সম্বিৎরূপ জ্ঞানকে মাথায় করেন, তিনি তদনুসঙ্গী প্রেমকেও মাথায় করেন। মূল কথা, বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্ত্বগত সম্বিৎ প্রেমই পূজনীয়, মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জ্জনীয়।

এখন দেখা যাক্, জ্ঞানদ্বারা কল্পিত বা করণীয় প্রেম বৈষ্ণবের পূজনীয় হতে পারে কি না? যদি না হয়, তবে সে প্রেমে যে উন্মত্ততা, তা জ্ঞানদ্বারাই হোক, বা জ্ঞানাভাবেই হোক, বৈষ্ণবের সহিত তার কি সম্বন্ধ? যদি সম্বন্ধই না থাকে, তবে বৈষ্ণবের নামে সে কলঙ্ক বিদ্বদ্-ব্যক্তিদ্বারা আরোপিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লিঙ্গ-শরীরদ্বারা অনুভূত আত্ম বা পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞানকে 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান' বলা যায়। এই লিঙ্গ-শরীরই প্রাকৃত বলে ঐ জ্ঞান মায়িক জ্ঞান, তা শুদ্ধ সম্বিৎ নয়। সেই জ্ঞানগত বৃত্তি প্রেম নয়, তা কাম। সেইরূপ কোন কাম-বিতরণ বৈষ্ণবের ভজনে নেই। লেখক সেই জাতীয় কাম স্বরূপ প্রেমনামধৃক্ বৃত্তির যথেচ্ছাচারিতা দেখে, প্রেমে উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লেখ করেছেন। লেখকের জানা উচিৎ, সেই বৃত্তি বৈষ্ণবের নয়। বৈষ্ণবের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হবার নয়। কারণ, জড়ীয় ভাব লয়েই উচ্ছৃঙ্খলতা। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জড়াতীত। তবে বৈষ্ণব-বেষধারী অনেক উপশাখার (যথা– কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, বাউল ইত্যাদির) জড়সঙ্গে যে সাধন-প্রণালী, তাতে জড়ীয় কামেরই তাণ্ডব থাকায় তা যে উচ্ছৃঙ্খল হবে, তাতে বিচিত্রতা কি? তাই বলে একের বোঝা অপরের ঘাড়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক নয়। বৈষ্ণব না চিনে বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিচার অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কয়েকটী গুণ বৈষ্ণবের থাকা আবশ্যক। যাঁতে ঐ সকল গুণ বর্ত্তমান, তাঁর প্রেম-ধর্ম্ম কি উচ্ছৃঙ্খল? বৈষ্ণবধর্ম কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হতে পারে না। লেখক ঐ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল-ধর্ম্মকে বা বহির্ম্মুখ কামসেবী উপশাখাগত সম্প্রদায়কে "বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" মনে করে এরূপ ভ্রমে পতিত হয়েছেন। তাঁর জানা উচিত, ধানের 'আগড়া' বাদে যা, তাই তণ্ডুল। সেইরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্থিতিও যথারীতিই আছে। তবে তা সাধারণে উপলব্ধি করতে পারে না।

যা দ্বারা বস্তু নির্দিষ্ট হয়, তাই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে ভগবান বিষ্ণু আরাধিত, যে আরাধনা বা সেবাবৃত্তি অণুস্বরূপ জীবের নিত্যসহচর, তাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যাঁতে অবিদ্যার যাবতীয় আবরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিলক্ষিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।

বক্তারই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম বিকাশশীল। অতএব বৈদিককাল যার মুকুল, পৌরাণিককাল তার ফলস্বরূপ। মুকুলে যা অব্যক্ত, ফলে তা ব্যক্ত। মুকুলে ব্রহ্ম নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার; ফলে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সক্রিয়-মায়ায় নিষ্ক্রিয় 'নির্ব্বিকা' হলেও সবিলাস; ইহাতে এত আক্ষেপ কেন? চক্ষু থাকে, উপভোগ কর। না থাকে, চক্ষুর জলে প্রার্থনা কর। চক্ষু না পেয়ে চক্ষুবানের মত কথা কেন? আত্ম-বঞ্চিত হওয়া কেন? ব্যক্তে মুক্তি সাক্ষাৎ। মাথা আপনিই নত হয়েছিল, কেহ চিন্তা করে, বই খুলে, তর্ক করে নত করে নাই। যিনি সেই প্রাণাধিক শ্রীমূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করবার শুভাকাংক্ষী, তাঁর পদে আপনিই মাথা নত হয়েছিল। তাতে আর নূতনত্বই বা কি? আর আশ্চর্য্যই বা কি? বা তাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবসাদই বা কি? বিষ্ণুর চিন্ময়-মূর্ত্তি বৈষ্ণবের নিত্যসহচর আগে ছিল না, এখন হয়েছে, তা নয়। অংশ বিষ্ণুর অংশী যেখানে যেরূপভাবে, সেইভাবেই অবতার। সে অংশের জ্যোতিঃ ভক্ত-নয়নে যে-ভাবে আপনি প্রতিভাষিত হয়, ভক্ত সেরূপ ভাবেই বর্ণন করেন। বিচার করে, সভা করে, ইতিহাস খুলে গবেষণা করবার তখন তো সময় হয় না। সে দরকার অন্ধের। .... তবে নারী-পূজা, তান্ত্রিক-অনাচার, ব্যভিচারের কথা বৈষ্ণবে কেন?

পূর্ণচন্দ্র নিতাই পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর আবরণ ভেদে কলাদির সংখ্যা। যে পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ দেখেছে, সে কলাদি হতে পূর্ণচন্দ্রকে নিত্য পৃথক দেখে। এইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নিত্য নারী-পূজা বা অনাচার-ব্যভিচার হতে পৃথক দেখেন।

লেখক-সমর; আমি সামান্য লূতাকীট। মধুর মত্ততায় তিনি উপনিষদে কবিত্বই দেখেছেন। কল্পনা ভিন্ন কবিত্বের সত্তা নাই। কল্পনা মায়াতীত নয়। যদি উপনিষদের বাক্য মায়াতীত হয়, তবে তা কল্পনা নয়। নিত্যসত্যের প্রতি-বাক্যই সত্য। কোথাও অমিল নাই। মায়াবরণে কলা দেখায়। নচেৎ পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রই আছে। ইতিহাসে তার তত্ত্ব পাওয়া যায় না। এইরূপে তা ধরতে পারা যায় না। যাহা ধরতে পারা যায়, তাহা সব পুস্তকেই আছে। আচার্য্য-অভাবে লোক তা বুঝিতে অক্ষম। ইতিহাস নিত্য তার কলার সংখ্যা করেই দিন কাটায়। এককথায় লূতাকীট ভ্রমরের বাদী হলেও প্রকৃতপক্ষে বাদী নয়, এই ধারণায় কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট লেখকের জন্য কৃপা ভিক্ষা করি এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তাঁর কৃপায় জয়-পরাজয়, বাদ-প্রতিবাদ হতে দূরে দাঁড়াতে ভিক্ষা করি। আজও তা হয় না, তাই লেখকের সহিত এ পরিচয়; অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কি ইচ্ছা, জানি না।

কিভাবে পারমার্থিক দৃষ্টিবোধ বিকশিত করা যায়

–শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

বৈদিক শাস্ত্রে একটি কথা আমরা দেখেছি **'শাস্ত্র-চক্ষুঃ'**, তার মানে শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সব কিছুকে দেখা। ভগবদগীতার মতো শাস্ত্রাদি আমাদের শাশ্বত সত্যের শিক্ষাই দিয়ে থাকে এবং সেই সত্যকেই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। ধর্মীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং জড় জগতে তার প্রকৃত স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি, এমন কি আমাদের জীবনের প্রতিদিনের সাধারণ কর্তব্য পালনের মাঝেও।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন, "আমিই সূর্য এবং চন্দ্রের আলো।" এই কথামতো প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ এই বিশ্ব প্রকৃতির মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। প্রত্যেকেই সূর্যকে প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং সূর্যের আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। আর এই সূর্যই হল ঈশ্বরের শক্তি, তাঁরই অংশ। আবার ঐ চাঁদ, যা অমন শান্ত রাতের সৌন্দর্য, তা–ঐ ঈশ্বরের সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঠিক সেই রকমই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমিই জলের সুস্বাদ।" জলের গুণাগুণের পরিচয় তার স্বাদের মাধ্যমেই বিচার্য হয়ে থাকে, আর সেই পবিত্র বিশুদ্ধতার স্বাদটুকুও ঈশ্বরের অন্যতম শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রীয়-চক্ষু উন্মীলন করে যাঁরা সব কিছু দেখেন, তাঁরা জলের ঐ সুস্বাদু ধর্মের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবং তৃষিত মানুষের কাছে এই পরম বিস্ময়কর তৃষ্ণা নিবারণকারী তরল জিনিসটি পৌঁছে দিয়ে পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করে থাকেন।

কিন্তু জড়জাগতিক জীবনে আমরা বহু নিরানন্দ ও দুঃখের মুখোমুখি হয়ে থাকি। সেগুলোই বা আমাদের কি শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বা কি বলে থাকে? জীবনটাকে উপভোগ করতে গিয়ে বা ভোগের সাগরে নিমগ্ন হয়ে বাস্তব জগতের অনেক মর্মান্তিক অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর সত্যে সাধারণত আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবনের নিষ্ঠুর পরিণতি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। কিন্তু আজকের দিনের সকল মানুষই এসব পরিণতিকে অবহেলা করে। শুধু তাই নয়, এসব অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু জরা-ব্যাধি-মৃত্যু জড়-জগতের জীবনের অবধারিত সত্য। এ থেকে কারও পরিত্রাণ নেই, তাই তো বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই সর্বদা এর শুভ বিকল্প খুঁজে থাকেন।

এ সম্পর্কে বুদ্ধের বাল্যজীবনের সুন্দর নীতিকাহিনী আছে। বুদ্ধদেব ছিলেন ভারতবর্ষের এক প্রতাপশালী রাজার রাজপুত্র। সুরক্ষিত রাজ প্রাসাদের সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যেই তাঁর জীবনটি অতিবাহিত হত। জীবনের কোন অভাব বা জড়-জাগতিক দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবার অবসর হত না। কিন্তু একদিন যখন তিনি প্রথম বহির্জগতে পা দিলেন, তখন তিনি সম্মুখীন হলেন জড়-জগতের অস্বস্তিকর পরিবেশের।
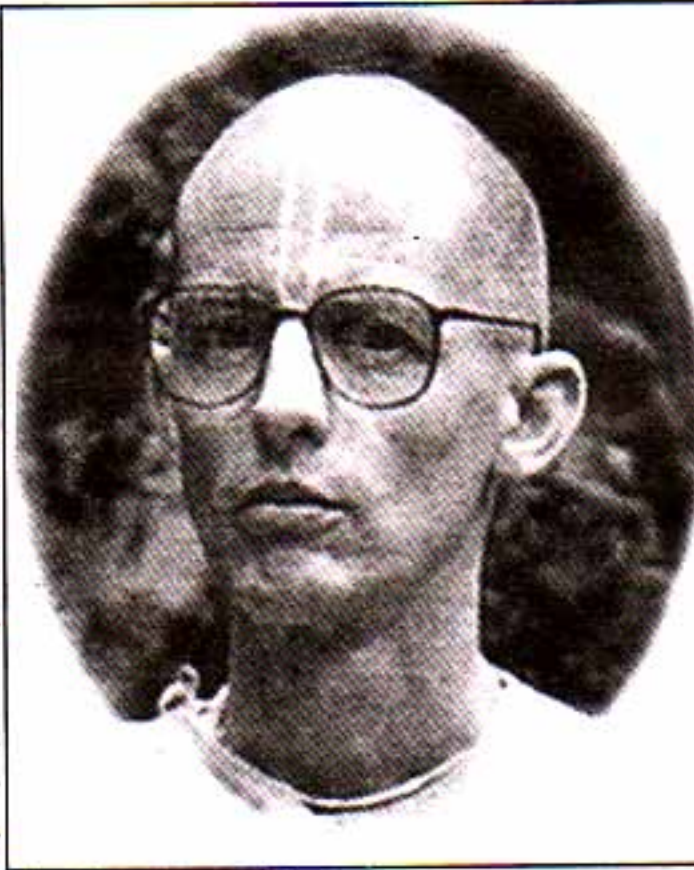
প্রথম দেখা হল দুরারোগ্য ব্যাধির ভারে বিকৃত জর্জরিত এক মানুষের। বুদ্ধদেব সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি হয়েছে?" সঙ্গীটি বলে উঠল, "লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত।"

রাজপুত্র আৎকে ওঠেন, "এ অবস্থা কি আমার-ও হবে?" উত্তর আসে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, একটা না একটা ব্যাধি আমাদের প্রত্যেকেরই হয়।"

এরপর যুবরাজ দেখলেন–বার্ধক্যের ভারে অবনত একটি মানুষ। তিনি জানতে চান। "কেন তার এ অবস্থা?" তার সঙ্গীটি বলে, "এটা হল বার্ধক্য, এই দুঃখময় পরিণতি প্রত্যেকেরই শেষ জীবনে কষ্ট দেয়।"

এভাবেই পরে তাঁর চোখের সামনে আসে এক শবদেহ। জড় জাগতিক জীবনের শেষ কথাটি তখন তিনি উপলব্ধি করেন এবং জানতে পারেন যে, এটাও তাঁর জীবনে আসছে এবং আসবে–সকল জড় দেহের জীবনের শেষ আঘাত–মৃত্যু। তাঁকে সঙ্গীটি বলে, "হ্যাঁ, আপনারও জীবনে এটি একদিন আসবেই।"

বুদ্ধদেব এসব দেখে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে-ছিলেন। সাধারণ মানুষের মতো তিনি অবধারিত দুঃখ-কষ্টের কথা অবহেলা করলেন না কিংবা এসব কোনরকমে এড়িয়ে চলা যাবে তাও ভাবলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, জড় জাগতিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে কারও পরিত্রাণ নেই, তাই কারও পক্ষেই প্রকৃত সুখী হওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে, তিনি নির্বাণ বা মুক্তির কথা উপলব্ধি করতে পারলেন। অর্থাৎ, বার বার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের বাইরে এক পরম অস্তিত্ব। আমরা নিশ্চয় ভগবান বুদ্ধের মতো সেই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হতে পারব না। তবে, বিভিন্ন মহাপুরুষ, সাধু-সজ্জন এবং ভগবদগীতা ও ভাগবতের উপাখ্যানের মতো শাস্ত্রাদির কৃপায় আমরাও অবশ্য সত্য দর্শন করতে পারি।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবকিছু দেখবার চর্চা করা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে সবচেয়ে সহজ। বৈদিক শাস্ত্রে, কঠোর পরিশ্রম করে অথচ কখনই আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করে না এমন মানুষের সঙ্গে ধোপার ভারবাহী গাধার তুলনা করা হয়েছে, যে সামান্য ক'টি ঘাস খেতে পাওয়ার প্রত্যাশায় সারাদিনই ধোপার বোঝা বহন করে চলে।

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ধ্রুবের নিষ্ঠা ও মহাপ্রভুর সহজ পথ

১৮ মার্চ ১৯৯৪ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত ভাগবত (৪/৮/৬৫) প্রবচন

– শ্রীমদ্ গোপালকৃষ্ণ স্বামী মহারাজ

ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন, তখন প্রাসাদে রাজা উত্থানপাদ কিভাবে আছেন, নারদ মুনি তা দেখতে যেতে মনস্থ করেছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে মহারাজ, আপনার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক বলে মনে হচ্ছে এবং আপনি যে দীর্ঘকাল ধরে কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? আপনার ধর্ম অনুষ্ঠানে, অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে কি কোনো বাধা সৃষ্টি হয়েছে?

শ্রীনারদ মুনিই ধ্রুব মহারাজকে বনে গমনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ ধ্রুব মহারাজ ভগবানের দর্শন লাভে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। কারণ ধ্রুব মহারাজ অপমাণিত হয়ে বিষাদগ্রস্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতার কোলে উঠে বসতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাণী সুরুচির ইচ্ছায় তা পারেননি। রাণী সুরুচি ছিলেন ধ্রুব মহারাজের বিমাতা। সেই বিমাতা ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন, "তুমি ভগবানের কৃপায় আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলে তবেই তোমার পিতার সিংহাসনে উঠে তোমার পিতার কোলে বসতে পারবে।"

ভগবান উপলব্ধি করেছিলেন যে, বালক ধ্রুব মর্মাহত হয়ে আন্তরিকভাবে ভগবানের কৃপালাভে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনা অভিলাষের কথা তাই ভগবান অচিরেই জানতে পারেন। এই সত্যটি কখনো ভুলে গেলে চলবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্পষ্ট বলেছেন, তিনিই স্মৃতি, তিনিই বিস্মৃতি। তেমনই ভগবানের উপাসনা করতে যারা আগ্রহী হয়, ভগবানই তাদের যথোপযুক্ত বুদ্ধি প্রদান করেন যার মাধ্যমে তারা ভগবৎ-উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে।

আবার যারা ভগবানকে ভুলে থাকতে চায়, তাদেরও ভগবান বিস্মৃতি প্রদান করেন এবং জড়জাগতিক সুখভোগের বুদ্ধি দেন।

তাই শ্রীনারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে পরীক্ষা করেছিলেন প্রকৃতই সেই বালকের ভগবৎ-দর্শনের আগ্রহ কতখানি। দীক্ষা প্রদানের আগে দীক্ষাগুরুও এইভাবে শিষ্যের ভগবৎ আরাধনা আকুতি পরখ করে দেখেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীকে দীক্ষা প্রদানের আগে শ্রীল রূপ গোস্বামীও নানাবিধ উপায়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। তেমনই, নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। আমাদের ইস্‌কন সংস্থার মধ্যেও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দীক্ষাগ্রহণের আগে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; দীক্ষাপ্রদানের আগে বেশ কিছু দিন শিষ্যকে লক্ষ্য করা হয় যে, পারমার্থিক জীবনযাত্রায় সে কতখানি উৎসুক।
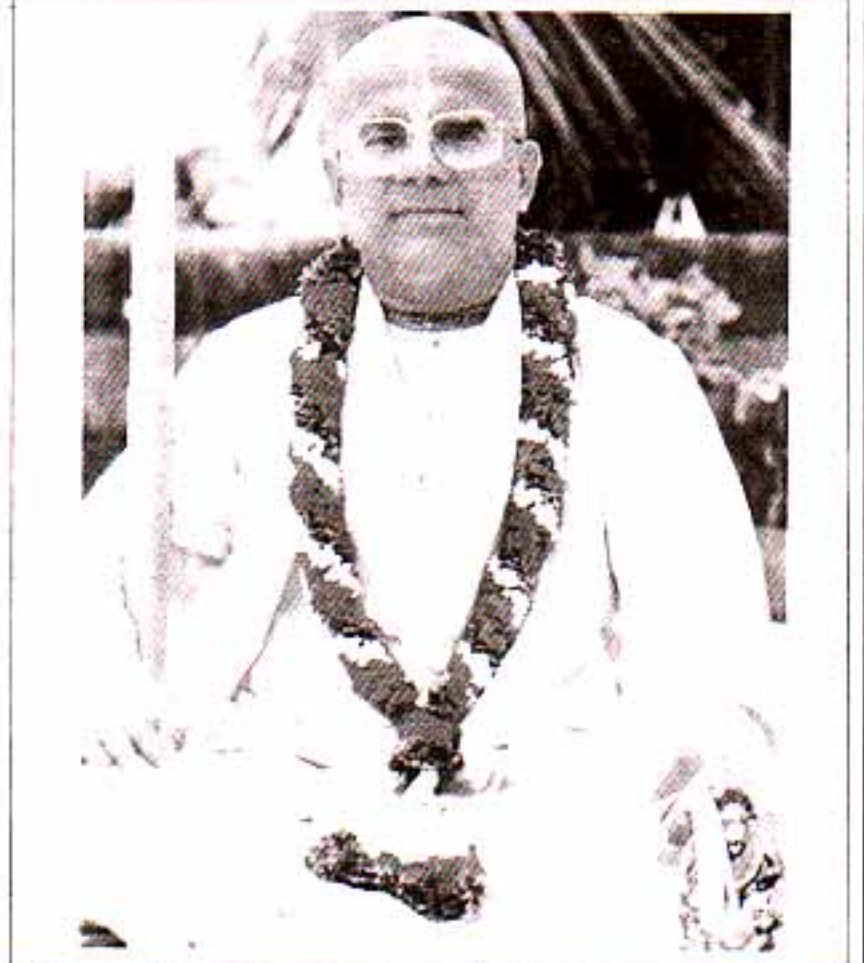
শ্রীনারদ মুনিও তাই ধ্রুবকে বলেছিলেন, "তুমি তো নিতান্ত বালক, এখন তোমার গৃহে বসবাস করাই উচিত। বনে গিয়ে তপস্যা করা তোমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।"

তবুও ধ্রুব মহারাজ বালক হলেও ক্ষত্রিয়পুত্রের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেছিলেন, "আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আমাকে সেই সৎ পন্থা আপনি প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে পারব।"

তখন শ্রীনারদ মুনি বলেছিলেন, "হে বৎস! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি যমুনার তটে মধুবনে যাও, সেখানেই ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন। সেখানে স্নান করে নির্জন আসনে তুমি উপবেশন কর। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত কর। তারপর ভগবানের ধ্যান শুরু কর।"

শ্রীনারদ মুনি তাঁকে **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'** মন্ত্রটি উচ্চারণ সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

এই মধুবনটি শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানেই বালক ধ্রুব মহারাজ একদা ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। আর সেই সময়ে তাঁর পিতা রাজা উত্থানপাদ তাঁর প্রাসাদে অত্যন্ত শুষ্কমুখে চিন্তাকুল হয়ে বসেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, মুখ থেকে মানুষের মন বোঝা যায়। আপনাদের মুখের ভাবে কিছুকালের জন্য কৃত্রিম অভিপ্রকাশ ঘটাতে পারেন, কিন্তু তা চিরকাল থাকতে পারা সম্ভব নয়।

শ্রীনারদ মুনি যখন রাজা উত্থানপাদের মুখ দেখে তাঁর বিষাদগ্রস্ত অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন রাজা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ, এবং আমি এতই অধঃপতিত যে, আমার পঞ্চবর্ষীয় বালকের প্রতি আমি অত্যন্ত নির্দয় হয়েছি। সে যদিও একজন মহাত্মা এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত, তবুও তার মাতা সহ তাকে আমি নির্বাসিত করেছি।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাগবত ভাষ্যের তাৎপর্য অংশে লিখেছেন, স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে সমাজে কত রকমের পাপকর্মে আমরা আজও লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছি। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ভগবান ঋষভদেবও তাঁর পুত্রদের প্রতি উপদেশ দান প্রসঙ্গে স্ত্রীসঙ্গ বিষয়ে মনঃসংযমের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিবাহিতা স্ত্রীর অন্য কোনো দিকে আসক্তি জন্মালে সে নিজ পতিকে দেহেমনে বহুকষ্ট দিয়ে পরিণাম বিনষ্ট করেও সেই আসক্তি পরিপূরণে উন্মত্তা হয়ে যায়।

ঠিক তেমনই, মানুষ যদি পারমার্থিক জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে থাকে অথচ নিজের মন এবং ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে না পারে, তা হলে তাদেরও বিনাশ অনিবার্য।

তাই ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২ তম শ্লোকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করতে করতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয়, এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

আমাদের চোখ দিয়ে দেখছি আর ভাবছি, সুন্দর একটা জিনিস আমার চাই, কারণ সেটি দেখতে ভালো, নাক দিয়ে কোনও কিছুর সুগন্ধ উপভোগ করছি, সুতরাং সেটিও চাই, কান দিয়ে মনোরম ধ্বনি শুনছি, জিভে লোভনীয় কোনও আস্বাদন গ্রহণ করছি- সবই চাই, তা ধর্মসঙ্গত হোক বা ধর্মবিরুদ্ধ হোক, শাস্ত্রসম্মত হোক বা অশাস্ত্রীয় হোক। ঐ রকম ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রশ্রয় দিলে তা থেকে কামনা-বাসনার আগুন জ্বলতে শুরু হয়। সেই বাসনা পূরণ না হলে রাগ জন্মে। আর ক্রমে সেই রাগের আগুনে বুদ্ধিভ্রংশ হয়, স্মৃতিবিলোপ ঘটে। তখন শুরু হয়ে যায় অধঃপতন।

অতএব ঐ ধরনের যে সব ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে পারমার্থিক প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে থাকে, কারণ মন চঞ্চল হয়, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় উপভোগ বাঞ্ছনীয় নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারলে তবেই ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। ইন্দ্রিয়গুলি পারমার্থিক অভিনিবেশে বিষম বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে।

এই কারণেই নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমরা যদি বিবিধ দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকতে বাস্তবিকই আগ্রহান্বিত হতে চাই; পরিবার-পরিজন, ইন্দ্রিয় উপভোগ, শারীরিক তৃপ্তি লাভ, সমাজ সেবা এবং পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহবোধ সংযত করতে চাই, তা হলে তার সর্বোত্তম পন্থা হলো পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠাভরে প্রেমভক্তি নিবেদনে সচেষ্ট হওয়া।

ইস্কনে এই কারণে অন্তত চারটি বিধিবদ্ধ সংযম পালনের মাধ্যমে মনকে নিজ বশে রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে – আমিষাহার বর্জন, নেশা ভাং বর্জন, জুয়া, তাস, পাশা বর্জন এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন। এই সংযম পালনের মাধ্যমে মনকে নিজ বশে রাখা যায় এবং তার ফলে মনকে কোনো অবাঞ্ছিত বিষয়ে অধঃপতিত হতে দেওয়ার পথ থেকে বাঁচানোর মতো আত্মিক শক্তি সম্ভব হতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় 'ধ্রুব' কথাটির অর্থ- সুদৃঢ়, সঠিক, অবিচল। সুতরাং পারমার্থিক অনুশীলনে বিকাশ লাভ করতে হলে ধ্রুব-নিশ্চিত হতে হয়- দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হয়। ধ্রুব মহারাজের জীবনকথা এই শিক্ষাই মানুষকে দিচ্ছে।

এমন কি, শ্রীনারদ মুনি বালক ধ্রুবকে নিরুৎসাহিত করে বলেছিলেন, "তুমি নিতান্ত বালক, যাও– বাড়িতে গিয়ে খেলা কর। বিমাতার কথায় অত গুরুত্ব নিও না। তিনি হয়ত তোমার সঙ্গে তামাসা করছিলেন। তামাসা সইতে পার না তুমি?"

কিন্তু বালক ধ্রুব মহারাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথে তিনি অবিচল হয়েছিলেন। মধুবনে তপস্যার সময়ে প্রথম মাসে কেবল তাঁর দেহ ধারণের জন্য, প্রতি দিন শুধুমাত্র কয়েতবেল খেয়ে কাটিয়েছিলেন। আমরা তো দিনে তিনবার খাবার খেতে অভ্যস্ত, আর খাবার ঠিকমতো রান্না না হলে কত বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকি। মধুবনে বালক ধ্রুব প্রথমে শুধুমাত্র কয়েতবেল খেয়ে দিন কাটাতেন–বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া ভালো ভালো ফলমূল নয়–খেতেন কয়েতবেল যা বনে বাদাড়ে বানরেরাই শুধু খায়।

দ্বিতীয় মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রতি দুদিন অন্তর কেবলমাত্র শুকনো ঘাস পাতা খেয়ে থাকতেন। আর তৃতীয় মাসে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন আরো কঠোর হয়ে ওঠে–তখন প্রতি নয়দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করতেন। চতুর্থ মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তখন জল পান করাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর শ্বাসগ্রহণ করতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন হয়ে বালক ধ্রুব পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভাগবতের এই অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ধ্রুব মহারাজ একজন আচার্য, এবং তিনি কঠোর তপস্যা করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। ধ্রুব মহারাজের ভক্তি আমাদের সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে– ভগবানের ভক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কত কষ্টে তাঁর দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হওয়া সহজ কাজ নয়, কিন্তু এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। সেই অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তদের কেবল চারটি নিয়ম পালন করে, প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে, বালক ধ্রুব মহারাজের তুলনায় আমরা ভগবদ্ভক্তি সাধনে কত নগণ্য। আত্ম-উপলব্ধির জন্য

ধ্রুব মহারাজ নিষ্ঠাভরে যা করেছিলেন, তেমন সাধনা করা আমাদের পক্ষে আজ সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই যুগের জন্য বিশেষ সুবিধা লাভ করেছি- শুধুমাত্র সুযোগ-সুবিধা মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন অভ্যাস করলেই ভক্তিমার্গে এগিয়ে যেতে পারব।

অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে, আচার্যগণ যেভাবে যুগে যুগে ভগবদ্ভক্তির নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেইগুলি নিষ্ঠাভরে সম্পাদন না করা হলে, আমাদের উদ্দেশ্য কখনই সাধন হবে না।

আমাদের কর্তব্য– ধ্রুব মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কঠোর নিষ্ঠাভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে মহামন্ত্র জপকীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে নিয়োজিত থাকা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে বলা হয়েছে, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিখিয়েছেন– ভগবানের আরাধনা করার জন্য ধ্রুব মহারাজের মতো কষ্ট করে আজ আর বনে যেতে হবে না– যে যেখানে আছেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন প্রতিদিন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করুন ভক্তিভরে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত ঘরে বসে গীতা-ভাগবত কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থসম্পদ থেকে কৃষ্ণ শিক্ষা আহরণ করতে থাকুন।

এই সবই আমরা শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সংকলিত গ্রন্থাবলি থেকে প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে আহরণ করবার সুযোগ পেয়েছি। আমরা যখন তাঁর গ্রন্থাবলি পাঠ করতে থাকি, তখন আমরা এমন এক রহস্য-গভীর গুহাপথের সন্ধান পাই, যার অন্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর মনে হয়। কারণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থাবলি যতই পাঠ করা যায়, ততই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের বিপুল সমাজকল্যাণকর পারমার্থিক তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিস্ফুট হতে থাকে– শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশাবলি এমনভাবে আমরা আগে খুঁজে কোথাও পাইনি। তাই জানতাম না, মহাপ্রভু আমাদের সকলের জন্য ভগবদ্ উপলব্ধির কত সহজ পন্থা নির্দিষ্ট করেছেন।

যেমন, ধ্রুব মহারাজের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা প্রসঙ্গেও শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বালক ধ্রুবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আদর্শ যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন, যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্ঠা প্রতিফলিত করেছেন, তেমনভাবে পৃথিবীর কোনো সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিপূর্বে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার ভাবধারা অবলম্বনে এই যে ইস্‌কন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে, এটি একটি বিশ্বব্যাপী কল্যাণকর শিক্ষা বিস্তারমূলক সংস্থা হয়ে উঠেছে। এই সংস্থার মাধ্যমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বিশ্বায়ন সম্ভব হয়েছে, যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে আজ যুগান্তকারী শ্রীচৈতন্যবাণী ঘরে ঘরে সুবিদিত হয়েছে এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উপযোগিতা বহু দেশের রাষ্ট্রনায়কেরাও সর্বান্ত-করণে স্বীকার করছেন। এক সাংস্কৃতিক মহাবিপ্লবে জগতবাসী মেতে উঠেছে।

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রায় একই জিনিস। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন যে, কোনও জিনিসকে সংজ্ঞাভিত্তিকভাবে গ্রহণ করা বা বুঝতে পারাটা হল তার প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা করা মানে কোনও কিছুকে প্রশংসা করা।

কৃষ্ণভাবনায় যত অগ্রসর হওয়া যায়, সেই শ্রদ্ধাক্রমে আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়– যে, আমি ওদের সাথে থাকতে চাই– ওরা বেশ ভাল লোক। শ্রদ্ধা তখন সাধুসঙ্গ-আসে পরিণত হয়। তারপর আসে– ওরা যা করছে আমিও তা করতে চাই। যা করছে তাই করার পর্যায় থেকে মনে হয়– শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা, গুরুদেবের সেবা করতে পারা– এগুলো একান্তই প্রয়োজনীয়। সেটাই হল উদ্দেশ্য– এই স্তরে পৌঁছতে পারাটাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

তারপর শ্রবণ, কীর্তন, সেবা-ক্রমোন্নতি হতেই থাকে। থামতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণকে খুশি করানোতে, ভক্তজনের সেবা সাধন করতে করতে একপ্রকার দৃঢ়তা আসে। তখন নববিধা ভক্তির 'দাস্য' পর্যায় প্রাপ্ত হই– যে, সমস্ত কাজেই আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস এবং তখন সেবায় আন্তরিকতা জন্মায়।

দাস্য মনোভাব থেকে মনিবের প্রতি যখন বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়, তখন তাঁকে সখা রূপে দেখতে শুরু করি। ঐভাবে পৌঁছে যাই নববিধা ভক্তির 'সখ্য' স্তরে। বন্ধু দুই প্রকারের হয়– এক শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অপরটি হল অন্তরঙ্গ মনোবৃত্তি পরিপোষক।

প্রায়ই, দুঃখ-কষ্টের শিকার হলে তবেই সখ্যের ভাবটি জাগে। সব কিছু যখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে কিছুর সমাধান করে উঠতে পারি না, তখন মনে পড়ে, 'ভগবান যা করছেন অবশ্যই মঙ্গলের জন্য'। শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের শুদ্ধ করে তুলতে চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সচেতন, তিনি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণ আমার বন্ধু। আমরা বুদ্ধির সরাসরি প্রয়োগে এইটা বুঝতে পারি– শ্রীকৃষ্ণ জানেন আমি কে, আমার কি চাই। এবং তিনি সেই মতোই সব কিছু সুন্দরভাবে আয়োজন করে দিচ্ছেন আমার শুদ্ধতার জন্য। কৃষ্ণভাবনায় প্রচারকার্যে যে নিযুক্ত, সে এমন মনে করতে পারে যে, সে-ও শ্রীকৃষ্ণের শুভাকাঙ্ক্ষী কারণ সে ভগবানের কাজই করে চলেছে। এটি হল সখ্যভাবের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়টি হল আরও নিকট সম্বন্ধের। সেখানে আন্তরিক কিছু দেওয়া-নেওয়া থাকে, সহজ কর্তব্যবোধ ও ঘনিষ্ঠতা থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ কোনও এক উচ্চস্তরের ভক্তের উদাহরণ দিয়েছিলেন যিনি ভগবানের সাথে সখ্যভাবের আবেশে মন্দির চত্বরেই শয়নে যেতে দ্বিধা করতেন না। তার মানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সম্মুখেই তিনি শুয়ে পড়ছেন। সুতরাং সম্ভ্রমজনিত দূরত্বটুকু অন্তরঙ্গ সখ্য সম্পর্কে নেই। সবই সহজ সাবলীল। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন এই পর্যায়টি হল কৃষ্ণময়তার অতি উন্নত এক পর্যায়। এইভাবে তিনি সখ্যভাবের ব্যাখ্যা করেছেন।

তারপর আসছে আত্মনিবেদন। এটিও অনেক উন্নত এক স্তর, কারণ এতে নিজ সত্তার সম্পূর্ণ উৎসর্গীকরণ বোঝায়। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে জীবসত্তা বা 'আমার' একাধিক সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে। আত্মা হল একটি সংজ্ঞা। যখন সমগ্র শরীর এবং মনও ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, সেটা এক আমিত্বের নিবেদন। এর থেকে প্রশ্ন আসে অহম্-এর। অহম্-কে সমর্পণ করতে পারাটা একটা বড় পদক্ষেপের আত্মনিবেদন। যমরাজ বলেছেন, আমি নিজের আত্মপরিচয়ের পরোয়া করি না। এটাই হল প্রকৃত আত্মনিবেদন।

দাস্য ভাব থেকেই সর্বোচ্চ আত্মনিবেদন

১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবচন থেকে সংকলিত (৪/২৮/৩০)

-শ্রীমদ্ ধনুর্ধর স্বামী মহারাজ

ধ্রুব মহারাজ শুধু একজন প্রভাবশালী রাজাই ছিলেন না, শুদ্ধ ভক্ত পরম্পরা ধারাও অন্তর্গত ছিলেন। তা সত্ত্বেও নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজের কাছে আসতেন ভগবৎ কথা প্রচার করে তাকে পারমার্থিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ রাখতে।

দক্ষ প্রচারকরা কেবল বচন ক্ষমতাতেই দক্ষ হন না,- সত্যটাও বলতে পারা চাই এবং শ্রোতাদের কাছে যাতে সেই বক্তব্য সহজবোধ্য হয়, উপস্থাপনাও সেই রকম হওয়া চাই, যেন বিষয়বস্তু নিজেই কথা বলবে।

যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় ঋষিরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে আগ্রহভরে শ্রবণ করছিলেন, তার কারণ শুকদেব গোস্বামী কেবল জ্ঞানটুকু শুধু পেয়েছেন তাই নয়, তিনি উপলব্ধি করতেও পেরেছিলেন। ফলে, সেই বিষয়টিই যেন তাঁর সাথে কথোপকথন করে চলেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের একটা বিশেষ গুণ ছিল তাঁর বক্তব্যকে কথোপকথন করতে পারা। একবার বৃন্দাবন থেকে আগত এক গোস্বামীর সাথে আমার আলাপ হয় এবং আমি জানতে চাই- সব কিছু কেমন এগোচ্ছে? উনি বলেন, লোকে আমাদের ধারণাগুলি ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু এই মন্তব্য থেকে এটাই বোঝা গেল যে, বিষয়বস্তুকে সকলের গ্রহণীয় করে উপস্থাপনা করা হচ্ছে না। মানুষকে কিছু বোঝানো সত্যিই কঠিন কাজ।

এক অনুষ্ঠানে এক ভদ্রলোকের সাথে আমার দেখা হয় যিনি শ্রীল প্রভুপাদকে চিনতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- একজন আচার্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যে আপনি কী দেখেছেন? উনি বলেছিলেন- মহান আচার্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদের দূরদর্শিতা সুদূরপ্রসারিত। তিনি আরও একটি ধারণা প্রকাশ করেছিলেন- তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ খুব দৃঢ় একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কারণ শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে যে কড়া চিঠিখানি লিখেছিলেন, সেটি তাঁর স্মরণে আছে। তারপর তিনি বললেন যে, শ্রোতামণ্ডলীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে তাঁর এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সুতরাং যে কোনও প্রচারকেরই এই গুণটা থাকা আবশ্যক- বক্তব্যকে ব্যক্তিগতভাবে 'কথা বলানো।'

পাশ্চাত্য দেশের উদ্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠী হিপিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী এবং কৃষ্ণভাবনার সন্দেশ প্রচার করতে গেলে ঐ বিষয়ে সুগভীর উপলব্ধি দরকার- তবেই তা তাদের বোঝানো সম্ভব হবে। সুতরাং মহান আচার্যদের এই গুণটি থাকে- আদান-প্রদানে নিকট যোগাযোগ স্থাপনা।

মাঝেমধ্যেই প্রচারকদের হতে হয় প্রভাববিস্তারী দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং কখনও পরোক্ষ পন্থা-অবলম্বী। নারদমুনি যখন ধ্রুব মহারাজের কাছে আসেন প্রচার উদ্দেশ্যে, তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে প্রচার করতে থাকেন। পরোক্ষভাবে কোনও বিষয়কে স্থাপন করার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়- পরোক্ষভাবে বলা সত্ত্বেও যাতে প্রকৃত বক্তব্যটা বিকৃত না হয়ে উপলব্ধ হতে পারে। অবশ্য এই পন্থাতেই প্রচারকার্য বেশি শক্তিশালী উপায়ে সম্পন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত আদি অন্যান্য বহু শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্দেশ্যও এই রকমই- কোনও কিছু সরাসরি ব্যক্ত না করে বিশ্লেষণ, উদাহরণ, কাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠককে উচ্চতর, মহত্তর বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'ধর্ম কি' তার ব্যাখ্যা করে বলছেন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিরকালের নিত্য সেবক রূপে নিজের শুদ্ধ আদি স্থানকে চিনতে পারাটা, তথা স্মরণ করতে পারাটাই ধর্ম। সংজ্ঞাভিত্তিক ব্যাখ্যায় ধর্ম হলো কোন কিছুর একান্ত নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বভাব, তার উপাদানসমূহ ও তার কার্যকারিতা, এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমাণিত করেছেন যে, ভক্তিরসের 'ধর্ম' বা উদ্দেশ্য হল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

সুতরাং ধর্মের কাজ হল জীবের মূল প্রকৃতি বা সত্তাকে উন্মোচন করা। এইটাই ধর্ম। কৃষ্ণভাবনার পথে উন্নতি করার অর্থ হল, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ। সেটাই পন্থা, সেটাই লক্ষ্যলাভ। 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন, সাধন ভক্তির অন্তিম মাধুর্য হল শ্রীকৃষ্ণকে কখনো বিস্মৃত না হয়ে সদাসর্বদা উজ্জ্বল স্মরণে রাখতে পারা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনকে নিবদ্ধ রাখার অভ্যাস করতে হবে। তা করতে করতে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে এবং তখন সর্বক্ষণ তাঁকে চিন্তা করা সম্ভব হবে।

যখন কারো চেতনা শুদ্ধতা লাভ করে, সে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না। কৃষ্ণলীলায় আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুপস্থিত তখনও গোপীরা ভাবছে- এই তো কৃষ্ণ রয়েছে। আমরাও গোপীদের স্তরে পৌঁছতে পারি। সেটা হলো উন্নত পর্যায়ের কৃষ্ণভাবনা। গুরুদেব এই সম্পদই দান করে থাকেন- "গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।" তখন আত্মা অন্তরেই সন্তুষ্টি উপভোগ করে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, ভক্তি হল অন্তরের সেই গভীর অনুভূতি যার থেকে আমাদের বিশ্বাস জন্মায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম। গুরুদেব এই ধারণাটাই প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, এই ধারণাকে উপলব্ধিতে আনার ক্ষমতটুকুও গুরুদেবই দিয়ে থাকেন।

পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে যারা এসেছে- তারা এই ধারণা থেকে কত শত যোজন দূরেই না ছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে ক্রিয়া করাই হল সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভাবধারা তাদের মধ্যে রোপণ করতে সক্ষম হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, শুধু তাই নয়- তাদের সমস্ত জীবন ও ধন এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সমর্পণও করিয়েছেন। সুতরাং গুরুদেব শুধু ধারণাটিই দেন না, তিনি সেই ধারণার প্রতি আকর্ষণও জন্মিয়ে দেন।

[বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

– শ্রীরবীন্দ্র স্বরূপ দাস

ভগবান যদিও সবসময় নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান, তবুও হৃদয় নির্মল না হলে এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে ভগবানের সবিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যে সমস্ত মানুষ জড় বিদ্যার অহংকারে মত্ত এবং জড় কলুষের দ্বারা আবৃত তারা কখনই ভগবানের সবিশেষ রূপ দেখতে পায় না এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই ধরনের মানুষেরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মানুষের কল্পনাপ্রসূত মূর্তি বলে মনে করে। তাই এই সমস্ত মূঢ় মানুষেরা যাতে ভগবানকে অবজ্ঞা করে ভগবানের চরণে অপরাধ না করে, তাই পূর্বে তাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

পরম করুণাময় ভগবান তাঁর করুণা সকলের ওপর বর্ষণ করেন। তাই এই ধরনের নাস্তিক মানুষেরা মন্দিরে গিয়ে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন না করলেও তিনি রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে পথে নেমে আসেন অধঃপতিত জীবদের দর্শন দান করে তাদের উদ্ধার করার জন্য। এইভাবে জগতের নাথ পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণ করেন।

জগন্নাথদেব এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের প্রতি তাঁর করুণা প্রদর্শন করলেও ভগবদ্বিমুখ নাস্তিকরা অনেক সময় তাঁর এই ঔদার্যের অবমাননা করে। মধ্যযুগে কয়েকজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান দর্শন করে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রায়ার ওদরিক নামক একজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক প্রথম রথযাত্রা মহোৎসবের সংবাদ ইউরোপে নিয়ে যায়। সে যে রকম বিকৃতভাবে সেই সংবাদটি পরিবেশন করেছিল, তা পরবর্তী কয়েক'শ বছর ধরে ইউরোপীয় মানুষদের চিত্তে গাঁথা ছিল।

সে জগন্নাথদেবকে একজন রক্তলোলুপ অপদেবতা বলে বর্ণনা করে, যিনি মানুষের রক্তপানে তৃপ্ত হন। তার বর্ণনা অনুসারে এই রক্তাক্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় কোন এক বিশেষ দিনে, এবং উন্মত্ত অবস্থায় বহু ভক্ত তাঁর রথের বিরাট চাকার তলায় নিজেদের বলি দেয়। এইভাবে সেই দেবতার প্রবল রক্ততৃষ্ণা তৃপ্ত হয়। যদিও তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা জগন্নাথদেব এবং তাঁর এই মহোৎসবের বিকৃত বর্ণনা স্বীকার করেননি, তবুও সাধারণ মানুষের কাছে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, ফলে ইংরাজী ভাষায় Juggernuat শব্দটির উদ্ভব হয়, যার অর্থ হচ্ছে প্রবল বিক্রমে পথের প্রতিবন্ধক দলনকারী।

আজ পৃথিবীর সবকটি বড় বড় শহরে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং তা বহু মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করছে। পৃথিবীর মানুষ জগতের পরম কল্যাণ সাধন করে এই আনন্দময় মহোৎসবটির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখছে।

রথযাত্রা মহোৎসবের এক অত্যন্ত গভীর চিন্ময় তাৎপর্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে খুব অল্প মানুষই অবগত। সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের ভক্তরূপে ভগবানের পরম করুণাময় প্রকাশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হতে হবে।

বদ্ধ জীবদের জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ'শ বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন। এবং ভগবানের এই অবতরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

কৃষ্ণ স্বয়ং এই জগতে সচরাচর অবতরণ করেন না। কিন্তু কোন বিশেষ দ্বাপরযুগে তিনি অবতরণ করেন এবং সেই দ্বাপরের শেষে যে কলিযুগের প্রকাশ হয়, সেই কলিযুগে তিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন কৃষ্ণভক্তরূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। দুটি কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপে অবতরণ করেন– (১), কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করার জন্য, এবং (২) বৃন্দাবনে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর অঙ্গকান্তি এবং রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন। সেটিই হচ্ছে তাঁর অবতরণের মুখ্য কারণ।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে জগন্নাথ-পুরীতে গমন করেন। তাঁর দর্শনে সমস্ত পুরীধাম বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়– চব্বিশ বছর বয়স্ক অপরূপ সুন্দর এক নবীন সন্ন্যাসী, তাঁর শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য এবং অন্তরের মাধুর্য সকলকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর পাণ্ডিত্য উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ও তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তার শিক্ষার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে বাধ্য করেছিল। সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে এই নবীন সন্ন্যাসীটি হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রতিষ্ঠার সম্মান উপভোগ করার জন্য জগন্নাথ-পুরীতে থাকেন নি। অচিরেই তিনি পদব্রজে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তারপর আবার জগন্নাথ-পুরীতে ফিরে আসেন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে রথযাত্রা মহোৎসবের ঠিক পূর্বে।

তারপরের ঘটনাবলী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে অপূর্ব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাসের আলোকে জগন্নাথদেব এবং তাঁর রথযাত্রা মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্য। ভগবত্তত্ত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এতই করুণাময় যে, সবচাইতে সেই দুর্লভ বস্তুটি তিনি সকলকে যেচে যেচে দান করে গিয়েছেন। ভগবানের করুণার মূর্ত প্রকাশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যথাযথভাবেই জগন্নাথ-পুরীতে জগন্নাথদেবের আরাধনা করা মনস্থ করেছিলেন, যিনি সবচাইতে অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করবার জন্য মন্দির ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসেন।

রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আগের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই উৎসবের প্রস্তুতিতে যোগদান করেন। পুরীর সমুদ্রোপকূলে জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দিরের প্রায় দু'মাইল দূরে রয়েছে একটি অপূর্ব সুন্দর দুগ্ধ শুভ্র মন্দির– তার নাম 'গুণ্ডিচা মন্দির'। রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রাদেবী এক সপ্তাহের জন্য এই মন্দিরে আসেন। অন্য সময় এ মন্দিরটি খালিই পড়ে থাকে।

সারা বছর ধরে খালি পড়ে থাকার দরুন এই মন্দিরটির অভ্যন্তরে ধুলাবালি জমে এবং রথযাত্রা মহোৎসবের ঠিক পূর্বে মন্দিরটি পরিষ্কার করা হয়। সে কাজটি সাধারণত করত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষেরাই, কিন্তু সেবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে বিস্মিত করে শত শত ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন।

মহা আনন্দে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের মেঝে, দেওয়াল এবং চত্বর সংমার্জন করেছিলেন, এবং তাঁর অনুগামীরাও তাঁকে অনুসরণ করে মন্দির সংমার্জনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এত উদ্যম সহকারে সংমার্জন করেছিলেন যে তাঁর সারা শরীর ধুলায় আবৃত হয়েছিল। গভীর প্রেমানন্দে কখনো কখনো মহাপ্রভু অশ্রু বিসর্জন করছিলেন এবং সেই অশ্রুর দ্বারা তিনি মন্দির ধৌত করেছিলেন। অবশেষে, মার্জনীয় (ঝাড়ু) দ্বারা মন্দির পরিষ্কৃত হলে মহাপ্রভু সমস্ত ধুলাবালি, কাঁকড় একত্রিত করেছিলেন বাইরে ফেলে দেওয়ার জন্য। অন্য সকলের ধুলাবালি একত্রিত করার পর দেখা গিয়েছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক পরিষ্কৃত ধুলাবালির স্তূপটি সকলের পরিষ্কৃত ধুলাবালির স্তূপটির থেকে বড়।

তারপর তাঁরা শত শত পাত্রে জল ভরে মন্দিরের অভ্যন্তর এবং সিংহাসন পরিষ্কার করেছিলেন। ভক্তেরা সারিবদ্ধভাবে একটি পুকুর এবং একটি কুয়ো থেকে কলসী ভর্তি করে জল নিয়ে আসছিলেন এবং হাতে হাতে সেই কলসীর জল মন্দিরে ঢেলে শূন্য কলসী ভরার জন্য ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এইভাবে বারবার মন্দির পরিষ্কার করা হল। সকলেই তখন মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করছিলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পরণের বসন দিয়ে মন্দির মার্জন এবং সিংহাসন পরিষ্কার করলেন।

এইভাবে মন্দির পরিষ্কার করা হলে মন্দিরটি এক অতি উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছিল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তা তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের মত নির্মল হয়েছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে গ্রহণ করার উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছিল।

গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে ভগবানকে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের হৃদয় পরিষ্কার করতে হয়। এই জড় জগতে আমরা আমাদের হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে রেখেছি এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে দিচ্ছি না। বহু জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের হৃদয়ে জড় কামনা-বাসনার আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছে। আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে, ঠিক যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রতিটি ধুলিকণা পরিষ্কার করেছিলেন। আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবর্জনা পরিষ্কার করার পন্থা অবলম্বন করে নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করি, তাহলে আমাদের হৃদয় অচিরেই নির্মল, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ এবং শান্ত হয়ে উঠবে। তখন সেই পবিত্র স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে তাঁর আসন গ্রহণ করবেন।

রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেব, বলদেব এবং সুভদ্রাদেবীর জন্য তিনটি রথ প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই রথে তাঁরা আরোহণ করার পর উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুবর্ণ মার্জনী দিয়ে অতি সন্তর্পণে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পথ পরিষ্কার করেছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র বহুদিন ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন বলে বিষয়ীর মুখ দর্শন করতে রাজী হননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দেখলেন যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র সাধারণ সেবকের মত পথ ঝাড়ু দিচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁকে কৃপা করতে মনস্থ করেন।

জগন্নাথদেবের রথ গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সাতটি সংকীর্তনের দলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি দলে ছিল ছয়জন মৃদঙ্গবাদক, একজন নর্তক, একজন মুখ্য কীর্তনীয়া এবং পাঁচজন দোহার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চারটি দল জগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে, দু'টি দল রথের দু'পাশে এবং একটি দল রথের পিছনে স্থাপন করেন।

শক্ত, মোটা রজ্জু ধরে অগণিত ভক্তবৃন্দ "জয় জগন্নাথ" "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে জগন্নাথদেবের রথ আকর্ষণ করতে থাকেন। রথের শত শত দর্পণ সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে। বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত রথের রেশম নির্মিত তোরণ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। শত শত চামর এক ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে। পুরীর মন্দিরের আকৃতি বিশিষ্ট রাজকীয় রথ এগিয়ে চলে– প্রতিটি রথ যেন এক একটি গতিশীল মন্দির।

রথ চলতে শুরু করলে চৌদ্দটি মাদল এক সঙ্গে বাজতে থাকে। অন্তরঙ্গ সহচর সার্বভৌম ভট্টাচার্য সহ মহারাজ

প্রতাপরুদ্র নিকটেই দাঁড়িয়ে জগন্নাথের সন্মুখে কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নৃত্য করতে দেখেন। নাচতে নাচতে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উচ্চৈস্বরে "জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করতে থাকেন।

চলমান রথের ভিতর উপবিষ্ট জগন্নাথদেবের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচতে থাকেন এবং রথযাত্রার জগন্নাথদেবের গভীর থেকে গভীরতর আবেগে মগ্ন হতে থাকেন।

জগন্নাথদেবের এই রথযাত্রা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ লীলার দ্যোতক। বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ সরল গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখা, পিতামাতা আদি গুরুজন এবং গোপবালিকাদের সঙ্গে তাঁর বাল্য এবং কৈশোর লীলাবিলাস করেন। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের বহিরঙ্গ কারণ হচ্ছে সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন। তাই একসময় সেই কর্মসম্পাদন করার জন্য তাঁকে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যেতে হয়। দৈত্যরাজ কংসকে বিনাশ করে তিনি মথুরার রাজা হন এবং তারপর সমুদ্রোপকূলে বৈকুণ্ঠসদৃশ দ্বারকা নগরীর রাজা হন। একে একে সমস্ত আসুরিক রাজাদের বিনাশ করে তিনি পৃথিবীতে পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করেন তখন তাঁর বিরহে ব্রজবাসীদের হৃদয় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁদের বিরহ বেদনা ছিল অসহনীয়, এর মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহ বেদনা ছিল সবচাইতে গভীর। তিনি তাঁর হৃদয়রাজ, তাঁর প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমে তিনি সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে ভালবেসে তিনি কলঙ্কিনীর অপবাদ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি। আর তারপর– তিনি চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। দিনরাত তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু পড়তে লাগল। কালের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এক-একটি নিমেষ যুগে পর্যবসিত হল এবং তিনি বিরহ-বেদনার সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। গোবিন্দ বিরহে তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হল। সেই বিরহ বেদনায় তিনি উন্মাদিনীর মত হয়ে গেলেন।

শ্রীমতী রাধারাণীর এই বিরাহানুভূতি অপ্রাকৃত, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক অপ্রাকৃত– সেখানে সমস্ত সম্পর্কের এবং সমস্ত অনুভূতির প্রকৃত রূপ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, সেটিই হচ্ছে যথার্থ। আর এই জড় জগতে যে সম্পর্ক এবং অনুভূতি, তা হচ্ছে তার বিকৃত প্রতিফলন। যেমন, এই জগতে যে প্রণয়ের সম্পর্ক তার ভিত্তি হচ্ছে কাম। অর্থাৎ, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্যকে ব্যবহার করার বাসনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর যে প্রণয় তার ভিত্তি হচ্ছে প্রেম। প্রেম হচ্ছে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের বাসনা এবং তাতে নিজের সুখ উপভোগ করার কোনরকম আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই প্রেমে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। এইভাবে দেখা যায় যে, প্রকৃত প্রেমে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত প্রেম, তা এই জড় জগতের কামের বিপরীত। অধিকন্তু জাগতিক অনুভূতিগুলি, যার ভিত্তিতে সমস্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলি অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনুভূতিগুলি অন্তহীন এবং চিরন্তন। সেগুলি কখনো ম্লান হয় না, তা চিরকাল বর্ধিতই হতে থাকে।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভোগ করছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি দুঃখ ভোগ করছিলেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। চিন্ময় জগতে দুঃখ বলে কিছু নেই, সেখানকার সমস্ত অনুভূতিগুলি বিভিন্ন রকমের আনন্দ। আর সেখানে বিরহও নেই। তাঁর সেই অপ্রাকৃত বেদনায় তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের আনন্দ অনুভব করছিলেন।

বিরহের ফলে প্রেম আরও, গভীর হয়,– তা এই জড় জগতেও প্রযোজ্য। মাকে যদি তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় কিভাবে তার বাৎসল্য স্নেহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। শুদ্ধ ভক্তরা কেবল চান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেম বর্ধিত করতে এবং শ্রীকৃষ্ণ গভীর বিরহানুভূতির মাধ্যমে তাদের সেই বাসনা পূর্ণ করার আয়োজন করেন। রাধা-প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির যে ভাব প্রকাশ করে গিয়েছেন, তা ভগবৎ-প্রেমের সর্বোত্তম প্রকাশ।

রথযাত্রা মহোৎসব এই অনুভূতিকে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করে। কেননা এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বহুকালের বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর পুনর্মিলন।

দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলদেব এবং সুভদ্রা, আর ছিল অসংখ্য রাজপুরুষ সহ অগণিত রথ, হাতি এবং ঘোড়া। সেইসময় সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কয়েকটি গরুর গাড়িতে করে ব্রজবাসীরাও বৃন্দাবন থেকে সেখানে আসেন।

শ্রীমতী রাধারাণী পুনরায় তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমাস্পদকে দর্শন করেন। তিনি যখন তাঁকে প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁর চারপাশে ছিল বহু রাজপুরুষ, হাতি, ঘোড়া। পরে তাঁদের আবার এক নির্জন স্থানে মিলন হয়। বহুকাল পরে তিনি আবার তাঁর প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে অব্যক্ত এক আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সেই মিলনের আনন্দ বহু বছরের বিরহানুভূতিকে পরাভূত করতে পারল না। পক্ষান্তরে, সেই অনুভূতি যেন আরও গভীর হয়ে উঠল। যদিও সেই কৃষ্ণ আগেরই মত কৃষ্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরণের রাজকীয় পোষাক, তাঁর হাবভাব ছিল ক্ষত্রিয় রাজার মত। কিন্তু রাধা-রাণী চাইলেন বৃন্দাবনের গোপবেশ পরিহিত গোপ-বালক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে, যাঁর হাতে বাঁশী ও গলায় বনফুলের মালা। পূর্বে যমুনার তীরে যেখানে তাঁদের মিলন হত, সেখানে তাঁকে দেখবার জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। এইভাবে শ্রীমতি রাধারাণী সবচাইতে গভীর আবেগে মগ্ন হয়েছিলেন। মিলনের আনন্দের সঙ্গে বিরহের আনন্দ একাধারে অনুভূত হয়েছিল। যদিও পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার আনন্দে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেই সঙ্গে আবার বিরহের অনুভূতিও

তাঁর হৃদয়কে শূন্য করেছিল। তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে রথযাত্রার অনুষ্ঠান। রাজকীয় মন্দির সমন্বিত পুরী হচ্ছে দ্বারকা, আর স্নিগ্ধ বাগানের ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে 'গুণ্ডিচা' হচ্ছে বৃন্দাবন। আর জগন্নাথের রথের সামনে নাচতে নাচতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে গভীর থেকে গভীরতর অনুভূতিতে আবিষ্ট হতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারাণীর সমস্ত অনুভূতিগুলি তিনি অনুভব করেছিলেন, এবং তাঁর নাচের মাধ্যমে তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্রীমতী রাধারাণীর সর্বোচ্চ ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচতে লাগলেন। তিনি যখন জগন্নাথের রথের আগে আগে নাচেন, তখন রথ এগিয়ে চলে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারাণীর মিলনের অভিনয় করে মহাপ্রভু নাচেন। তাঁর সেই নৃত্যে হর্ষ ও বিষাদের সমস্ত অনুভূতিগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। গুণ্ডিচার পথে শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীচৈতন্য পুনরায় সেই মধুর লীলার অভিনয় করেন। রাধারাণীর ভূমিকা অবলম্বন করে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি রথাগ্রে নৃত্য করেন। রাধাপ্রেমে জগন্নাথ কৃষ্ণ এগিয়ে চলেন।

কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনবাসীদের কথা ভুলে গেছেন, সেই ভাব ব্যক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার রথের পিছনে চলে যান। তখন রথ থেমে যায়। এভাবে কৃষ্ণ জগন্নাথ বুঝিয়ে দেন যে তিনি বহুগামী। শ্রীমতী রাধারাণী ও বৃন্দাবনের সবকিছু চিরকালই তাঁর সবচাইতে প্রিয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রথাগ্রে এসে নাচতে শুরু করেন, ততক্ষণ রথ চলে না। তারপর রথ আবার চলতে শুরু করে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দেন শ্রীমতী রাধারাণীকে ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। বৃন্দাবন ছেড়ে আর কোথাও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচায় নিয়ে যান এবং তাঁকে পূর্ণ তৃপ্তি দান করেন।

রথযাত্রা মহোৎসবে জগন্নাথদেবের সঙ্গে এই অসাধারণ লীলাবিলাস করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিন্ময় জগতের সবচাইতে গূঢ় ও সবচাইতে মধুর লীলা প্রকাশ করেছেন। এই জড় জগতে মানুষ শুধু মৃত জড় পদার্থ রূপে দু'এক ফোঁটা আনন্দ আস্বাদনের জন্য নিরর্থক চেষ্টা করে চলেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে অন্তরঙ্গ লীলা প্রকাশ করে দেখিয়ে গেলেন যে কৃষ্ণভাবনার অমৃতের সঙ্গে জগতের কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

বহুকাল ধরে এই জগৎ ভগবানের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের কথা শুনেছে, কিন্তু তা তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাধুর্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। ভগবানের সর্বাকর্ষক রূপ প্রকাশিত হয় যখন শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই জগতে অবতরণ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ যে কত আকর্ষণীয় তা আরও পূর্ণরূপে প্রকাশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কত প্রিয় তা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করি। রথযাত্রায় সর্বোত্তম ভগবৎ-প্রেম প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে সেই প্রেম লাভ করা যায়।

ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনরূপ সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি তা করেছিলেন। এই অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক পন্থাটি এমনই চিন্ময় শক্তিসম্পন্ন যে কোনরকম আর্থিক সঙ্গতি ব্যতীতই যে কোন মানুষ এই সংকীর্তনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তরে পারমার্থিক উপলব্ধি লাভ করতে পারে। নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সব রকম জড় কামনা-বাসনা বিনষ্ট হয়। সে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "তার ফলে হৃদয়ে সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের আবর্জনা পরিষ্কৃত হয়।" সূক্ষ্ম এবং স্থূল সব রকম জড় কামনা-বাসনা দম্ভ এবং অহংকার প্রসূত। সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা, ক্রোধ এবং ঘৃণার সমস্ত উন্মত্ততা– এই সবই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে অবশেষে নির্মূল হয়ে যায়। ঠিক যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করেছিলেন সেভাবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, এবং তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনও প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন-যজ্ঞ একটি আন্দোলন, কেননা তা সকলকেই জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু অনুগামী মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং অন্য অনেকে মুসলমান নবাবের অধীনে কাজ করতেন বলে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁরা কেউই জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে পারতেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন জগন্নাথদেবের সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভক্ত। এই সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে ভগবানের আরাধনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন যে পারমার্থিক উন্নতি জাতি ও কুলের বিচার করে না; তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অন্তরের পবিত্রতার উপর। আর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যেহেতু সবচাইতে অধঃপতিত জীবকেও চিন্ময় স্তরে উন্নীত করে, তাই এই পৃথিবীর কেউই জগন্নাথের আরাধনা থেকে বঞ্চিত নয়।

এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবাইকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। এই পুরীতে কুড়ি বছর ধরে তিনি জগন্নাথদেবের আরাধনা করেছিলেন, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় তিনি রথের সামনে কীর্তন এবং নৃত্য করতেন। তার ফলে সবচাইতে অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধারকারী করুণাময় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পৃথিবীর সবকটি শহরে রথযাত্রা মহোৎসবের মাধ্যমে তাঁর করুণা বিতরণ করছেন।

(অনুবাদ – ভক্তিচারু স্বামী)

একাদশী তত্ত্ব : একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

[পূর্ব প্রকাশের পর]

উদাহরণ ঃ (৪) একই পঞ্জিকার ৩৯০ পৃষ্ঠার ১২/৪/২০০৭ইং বৃহস্পতিবার লক্ষ্য করুন। ঐদিন দশমী রাত্র ৪/২৭/৫৪ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ১৩/৪/২০০৭ইং শুক্রবার রাত্রি ২/৪৪/৫৫সেঃ পর্যন্ত থাকবে। দশমী বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টা অতিক্রম করায় একাদশী কপালবিদ্ধা হয়েছে। তাই শুক্রবার দিন নিম্বার্কমতে একাদশী না হয়ে শনিবার দ্বাদশী দিন হবে। আবার শুক্রবার দিন সূর্যোদয় প্রাতে ৫/৫২/৪৯ সেঃ গতে হবে। এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/১৬/৪৯ সেঃ পাওয়া যায়। এই সময়ের পরেই-অর্থাৎ ৪/২৭/৫৪ সেঃ গতে একাদশী আরম্ভ হবে। তাই একাদশীটি দশমী বিদ্ধা হবে। ফলে শুক্রবার দিন একাদশী না হয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায় মতেও শনিবার দিন হওয়ার কথা। তবে শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী সূর্যোদয়ের পূর্বে কমপক্ষে ৩২/১ দন্ড-অর্থাৎ ১ ঘন্টা ২৪ মিঃ একাদশী থাকা চাই। তাহলে সেটি দশমী বিদ্ধা হবে না বলা হয়েছে। তাহলে সূর্যোদয় ৫/৫২/৪৯ সেঃ থেকে ২৪ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/২৮/৪৯ সেঃ। একাদশী এর পূর্বেই বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/২৭/৫৪ সেঃ গতে আরম্ভ হবে। তাই শ্রীহরিভক্তি বিলাস এর বক্তব্য অনুযায়ী শুক্রবার দিন একাদশী হতে পারে। পাঠকগণ, লক্ষ্য করুন প্রায় ১ মিনিটের হের ফেরে সিদ্ধান্ত কিন্তু দুই ধরনের এসে যায়। এরূপ একাদশীর বেলায়ই সচরাচর গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্কন-এর চার্টের মধ্যে একাদশীর দিন সম্পর্কে মতদ্বৈততা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে অহেতুক বিতর্ক এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করে যার যার সময় পরিমাপ অনুযায়ী একাদশীব্রত করাই ভাল মনে হয়।

(গ) স্মার্ত্ত মত অনুযায়ী একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারণ ঃ

স্মৃতি শাস্ত্রের পন্ডিত শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এর মতে একমাত্র সূর্যোদয় বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করতে হবে। অরুনোদয় বিদ্ধা ত্যাগ সম্পর্কে তিনি কোন মতামত দেন নাই। (১) আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে যে, স্মার্ত্তপাদ বৈষ্ণব মতালম্বী ছিলেন না। এই জন্য তিনি দশমী বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করার কথা বলেন নাই। তার এই মতের ভিত্তিতেই প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতে আমরা একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করি। পঞ্জিকাকারীগণ স্মার্ত্ত মতে একাদশীর দিন নির্ধারণ করে পরিশেষে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে নিম্বার্ক মতে পরাহে গোস্বামী মতে পরাহে, ইত্যাদি বচন অন্তর্ভুক্ত করেন। এককথায় স্মার্ত্ত মতে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত বিদ্ধা একাদশীর উপবাস করা যাবে- ঐ বিদ্ধা কপাল বিদ্ধাই হোক অথবা দশমী বিদ্ধাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। নীচে দুইটি উদাহরন দেয়া হল পাঠক-পাঠিকাদের বুঝার জন্য।

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ৩২৩ পৃষ্ঠার ১২/২/২০০৭ইং সোমবার লক্ষ্য করুন। এই দিন রাত্রি ২/৫৫/১১ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। দশমী অর্দ্ধরাত্রি অতিক্রম করায় পরের দিন ১৩/২/২০০৭ইং মঙ্গলবার নিম্বার্ক মতে একাদশী হবে না। অথচ স্মার্ত্তমতে ১৩/২/২০০৭ইং তারিখেই একাদশী হবে।

উদাহরণ ঃ (২) নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা ১২/১০/২০০৫ইং বুধবার দেখুন। এইদিন শেষ রাত্রি ৪/৫৩/১৯ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ১৩/১০/২০০৫ ইং বৃহস্পতিবার রাত্রি ২/২৮/৪১ সেঃ পর্যন্ত ছিল। এই দিন প্রাতে সূর্যোদয় ৬/৫/২৮ সেঃ গতে ছিল। এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে বুধবার রাত্রি ৪/২৯/২৮ সেঃ হয়। এই সময়ের পরেই একাদশী আরম্ভ হয়েছিল (৪/৫৩/১৯ সেঃ)। ফলে একাদশীটি অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা ছিল। ফলে স্মার্ত্ত মতে বৃহস্পতিবার একাদশী হলেও গৌড়ীয় এবং নিম্বার্কমতে একাদশী ১৪/ ১০/ ২০০৫ ইং তারিখে শুক্রবার একাদশী হবে।

স্মার্ত্ত, নিম্বার্ক এবং গৌড়ীয় মতের মধ্যে তুলনা ঃ

একাদশীর উপবাসের দিন নির্ধারন সম্পর্কে স্মার্ত্ত শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতের সাথে শ্রী হরিভক্তি বিলাস-কারের (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু) মতদ্বৈততা আছে। স্মার্ত্তপাদের মতে সূর্যোদয় বিদ্ধা একাদশী শুধুমাত্র পরিত্যাগ করতে হবে। অপরাপর বিদ্ধা নয়। অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা ত্যাগ সম্পর্কে তিনি সরাসরি কোন সাধারণ মত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিথি তত্ত্বে সর্বশেষ মীমাংসা করেছেন এই বলে যে অরুনোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা বৈষ্ণবের কর্তব্য। আবার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু ও স্মার্ত্তপাদের বচনসমূহ "অবৈষ্ণব পর" বলে মত প্রকাশ করেছেন। এজন্য সহনশীল হলে এই দুই মতের মধ্যে কোন মারাত্মক বিরোধ নাই বলা যায়। কারণ স্মার্ত্তপাদ নিজেও অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা "বৈষ্ণবপর" বলে মেনে নিয়েছেন বা ব্যবস্থা দিয়েছেন। এজন্যই প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতে (যেগুলো মূলতঃ স্মার্ত্তমত অনুযায়ী লেখা) দশমী বিদ্ধা হলেও একাদশীর ব্যবস্থা আছে এবং পাশাপাশি পরদিন

বৈষ্ণবদের জন্য একাদশীর কথা বলা হয়েছে। এজন্য যারা স্মার্ত্ত মতে বিশ্বাসী অথচ এই বিষয়ে আজও তারাই "গোস্বামী মতে পরাহে" "গোঁসাইদের দ্বাদশীর দিন একাদশী" -এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করে বৈষ্ণবদেরকে উপহাস করার চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় অরুনোদয় বিদ্ধা বা দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই। তবে বেধ সম্পর্কে মতভেদ আছে। শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-এর মতে সূর্যোদয়কালে দশমী থাকলেই বিদ্ধা হবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলেন-সূর্যোদয়ের চারিদন্ড পূর্বে দশমী থাকলেই একাদশী দশমী বিদ্ধা হবে। আবার নিম্বার্কপন্থীরা বলেন পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রিকাল সামান্য অতিক্রম করলেও একাদশী বিদ্ধা হবে। এইসব ক্ষেত্রে যিনি যেই মতে বিশ্বাসী তিনি সেই মতেই একাদশী করবেন। এই নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে অযথা তর্ক-বিতর্ক অথবা ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করাই ভাল। অর্থাৎ যিনি যে মতের অনুসারী সেই অনুযায়ী বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করবেন।

কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শুদ্ধা (বিদ্ধা নয়) একাদশী ত্যাগ করেও দ্বাদশীতে ব্রত করতে হয়। তাহলে শুদ্ধা একাদশী বলতে যে একাদশী অর্দ্ধরাত্রি (কপালবেধ), দশমী অথবা সূর্যোদয় বিদ্ধা নয় তা বুঝতে হবে।

উদাহরণ ঃ লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ২৮/৩/২০০৭ইং বুধবার লক্ষ্য করুন। এইদিন দশমী দিবা ৪/৪/৪৯ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন দিবা ৪/২২/৯ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। একইদিন সূর্যোদয় প্রাতে ৬/৭/৯ সেঃ গতে হবে। তথ্য থেকে দেখা যায় এই একাদশী অর্দ্ধরাত্রি বিদ্ধা নয়। তাই দশমী এবং সূর্যোদয় বিদ্ধা হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাই এটি শুদ্ধা একাদশী বলা যায়।

শুদ্ধা একাদশী বিশেষ অবস্থায় ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করার ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে স্মার্ত্তপাদের মত হলঃ "যদি শুদ্ধা একাদশী দ্বাদশীর দিনও প্রাতঃকালে কিছু থাকে তাহলে একাদশী পরিত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করিবে।" এই একটি মাত্র বচন স্মার্ত্তমতে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু) অনেক শাস্ত্র পর্যালোচনা করে আরো কয়েকটি শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করায় স্থল দেখিয়েছেন। স্কন্দ পুরানে লিখিতি আছে-

একাদশী যদা পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হেক্যাদশীং ত্যক্তা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥

-অর্থাৎ অরুনোদয় পূর্ব থেকে আরম্ভ হয়ে সম্পূর্ণা একাদশী হলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হয়ে পরের দিন ত্রয়োদশীতে কিছু মাত্র থাকলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে উপবাস করা উচিত। এরূপ ৮টি দ্বাদশীতে উপবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে পূর্বদিনের শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করতে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই। এই ৮টি দ্বাদশীকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ মহাদ্বাদশী বলেছেন। শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। শুধুমাত্র বলেছেন, একাদশী অহোরাত্র ব্যাপী (অর্থাৎ দিন-রাত্রি বা ৬০ দন্ডব্যাপী) থেকেও পরদিনও কিছু নিষ্ক্রান্ত (থাকলে) হলে পূর্বদিনব্রত না করে দ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে। একে শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার (শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ) উন্মিলনী মহাদ্বাদশী বলেন এবং ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপাদ এরূপ নামকরণ না করে ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের সুপারিশ করেছেন। অপর সাতটি মহাদ্বাদশী দিনের ব্যাপারেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বলেন এই অষ্ট মহাদ্বাদশী বৈষ্ণবগণ কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

উদাহরন ঃ লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা ৮/৫/২০০৬ ইং সোমবার লক্ষ্য করুন। এইদিন একাদশী অহোরাত্র-অর্থাৎ ৬০ দন্ড থেকেও পরদিন ৯/৫/২০০৬ ইং মঙ্গলবার ৪/১৭/৪৩ দন্ড ব্যাপী-অর্থাৎ সকাল ৭/১৬/২০ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর দ্বাদশী আরম্ভ। সোমবার অহোরাত্র-অর্থাৎ পুরোদিন-রাত্রি একাদশী থাকলেও মঙ্গলবার কিছু থাকায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্যের মতে সোমবার না হয়ে মঙ্গলবার একাদশী হবে। এজন্য পঞ্জিকায় সোমবার একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারন না করে গণনাকারীরা স্মার্ত্ত মতানুসারে মঙ্গলবারদিনই একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা রেখেছেন (উক্ত পঞ্জিকার পৃষ্ঠা ২৭ দেখুন) একেই শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার উন্মিলনী মহাদ্বাদশী বলেছেন। ইস্কন এর একাদশী চার্টে এটিকে উন্মিলনী মহাদ্বাদশী না বলে মোহিনী একাদশী বলা হয়েছে (ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে পত্রিকার মার্চ ২০০৬ইং সংখ্যা দেখুন)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল শ্রীহরিভক্তি বিলাসকারের মতে অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করতে হবেই। আবার মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পেলে শুদ্ধা একাদশীও ত্যাগ করতে হবে।

গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্কন-কর্তৃক নির্ধারিত একাদশীর দিন-এর মধ্যে পার্থক্য এবং তার ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক একাদশী ব্রতের দিন এবং পারণ সম্পর্কে যে চার্ট প্রকাশ করা হয় সেটি মূলতঃ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রী চৈতন্য মঠ কর্তৃক নির্ধারিত। আবার বাংলাদেশে ইস্কন কর্তৃক একাদশী ব্রতের দিন এবং পারণের যে চার্ট প্রকাশ করা হয়, সেটি মূলতঃ শ্রীধাম মায়াপুর থেকেপাঠানো হয়। একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে কিছু একাদশীর দিন সম্পর্কে অমিল লক্ষ্য করা যায়।

[চলবে]

যত নগরাদি গ্রামে

ভোলায় সনাতন ধর্মসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ বাংলায় বঙ্গোপসাগর উপকূল অঞ্চলে, নদ-নদী ও বৃক্ষরাজী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই ভোলা দ্বীপ।

এখানে ৩০ লক্ষাধিক লোকের বাস। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সনাতন ধর্মসভা। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ 'ইস্‌কন' ঢাকা- স্বামীবাগ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ভোলাবাসীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ৩০শে মে থেকে ৪ঠা জুন, পাঁচ দিন জেলার তোজিমুদ্দিন ও চরফ্যাশন থানায় সনাতন ধর্ম সভায় ৩০ জন ভক্ত যোগদান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব শান্তিকল্পে নগর সংকীর্তন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করা, ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা, দু'টি ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেছিলেন ভক্তপ্রবর শ্রী প্রবীর চৈতন্য দাস ও শ্রী পরেশ চন্দ্র দেবনাথ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন থানা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ শুকুর আলী। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগত ইস্‌কন টি.টি.সি. শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ দাস অধিকারী, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় চেয়ারম্যান জাকির হোসেন হাওলাদার, বাংলাদেশ ইস্‌কনের সহ-সভাপতি শ্রী সেবানিধি দাস ব্রহ্মচারী, প্রধান আলোচক ছিলেন সুদূর মায়াপুর ভারত থেকে আগত শ্রী বিহারী কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী, চেয়ারম্যান, স্বামীবাগ আশ্রম। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন– শ্রী সত্যচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী শুভ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী জ্যোতিশ্বর গৌর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী নিতাই দয়াল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম চৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী মধুসূদন দাস ব্রহ্মচারীসহ আরো অনেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে ভক্তরা সনাতন ধর্মের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানবজীবনের গুরুত্ব এবং শ্রীল এ.সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে শান্তির দূত হয়ে এসে যে শান্তির বাতাবরণ বয়ে দিলেন তার উপর আলোকপাত করলেন। তাই মহাপ্রভুর নির্দেশিত পন্থায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে মানুষ শান্তি পেতে পারে। প্রতিটি ইস্‌কন ভক্তরা সভায় উপস্থিত ভক্তদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে নিত্য কীর্তন করে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলেন। ভোলাবাসী অল্প সময়ের জন্য হলেও এই মহাপ্রভুর সংকীর্তনে মেতে উঠল। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যেও কৃষ্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল।

বুয়েটে লাইব্রেরী উদ্বোধন

ধর্ম মানুষের জ্ঞান, কলা, প্রথা, মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ধর্মের মাধ্যমে মানুষের লালিত বোধ, চেতনা, চিন্তা ও নৈতিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষা লাভ করার জন্য প্রয়োজন একজন আদর্শ ধর্মগুরু যিনি ধর্মীয় বিষয়গুলো সহজে তুলে ধরবেন। আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ খুবই গর্বিত যে, বিভিন্ন ধর্মীয় মন্দিরগুলো এই ব্যাপারে সাহায্য করেন।

বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ (উঃ) হলে একটি উপসনালয় আছে। সেখানে ভক্তরা উপস্থিত থেকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ১০:৩০ মিনিটে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং ভক্তরা প্রতি মাসে আসেন। আজ পর্যন্ত যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইস্‌কন মন্দির হতে ব্রহ্মচারী ভক্তরা আসেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদেরকে অবগত করেন।

গত বৃহস্পতিবার ১৪/০৬/০৭ তারিখে বুয়েটের মন্দিরে লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। এই উপলক্ষে ইস্‌কন মন্দির হতে ভক্তরা আসেন লাইব্রেরী উদ্বোধন করার জন্য সেই সাথে শ্রীল এ.সি. ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক রচিত ইস্‌কন প্রকাশিত অনেক ধর্মীগ্রন্থ লাইব্রেরীতে দান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন– শ্রী পতিতউদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী মিত্রগোপা কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। বৈদিক সংঘের সাবেক সভাপতি রাজীব দে, সাবেক সম্পাদক সঞ্জয় দে, সম্পাদক সঞ্জয়সহ বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রবৃন্দ। গীতা পাঠের পর সুন্দর মনঃমুগ্ধকর আলোচনা করেন শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী। এতে ছাত্রদের খুবই আশাব্যঞ্জক সারা পাওয়া যায় এবং প্রভুরা বিভিন্ন প্রশ্নের যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর প্রদান করেন।

নিবেদক – অর্জুন চন্দ্র পাল
সভাপতি
বৈদিক সংঘ, বুয়েট।

ন্যাশনাল স্টুডেন্ট কম্পিটি
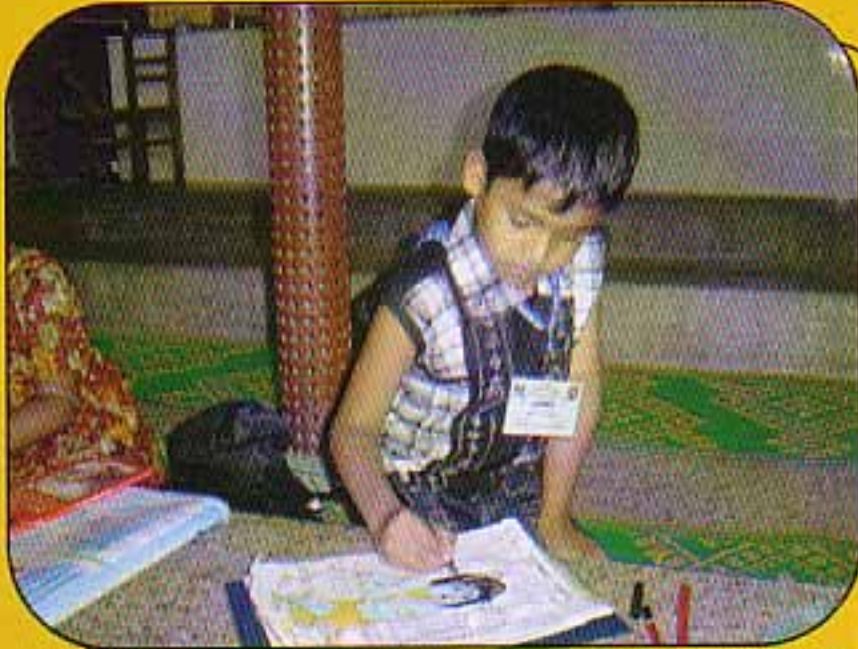
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো ন্যাশনাল ষ্টুডেন্ট কম্পিটিশন। যা বর্তমান আধুনিক সভ্যতার দিক্‌ভ্রান্ত কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিযোগীতার আয়োজন করে । ১০টি বিষয় নির্দিষ্ট করে শুরু হয় এই প্রতিযোগীতা, যা ছিল– গীতার শ্লোক আবৃত্তি, ভজ
বিভাগে প্রথম রাউন্ডে ৩য় শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত- ২৮টি কেন্দ্রে প্রায় ৭ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহন করে । ঢা
অবিভাবকবৃন্দ ও জাগ্রত চেতনাদীপ্ত প্রতিযোগীগণ, তাঁদের প্রত্যেকের মাঝে এক অধ্যাত্মভাব ও উদ্দীপনা জেগে ওঠে। ইস্
আধ্যাত্ম জীবন সর্ম্পকে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ২দিনের তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। তিনি প্রত্যেক বছর এই প্র

শন (রিলিজিয়ান)- ২০০৭

ক-যুবতী ও ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের মাঝে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করেছে। ইস্‌কন বাংলাদেশ এই
র্তন, কুইজ, চিত্রাংকন, বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তৃতা, স্ব-রচিত ভগবৎ বিষয়ক কবিতা , পৌরাণিক সাজ, অভিনয় ইত্যাদি। ৩টি
চূড়ান্ত- পর্বে প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৩ জন করে অংশগ্রহন করে। বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী সুযোগ্য
অন্যতম সন্ন্যাসী ও জিবিসি শ্রীল ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন,
গীতা আয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন।
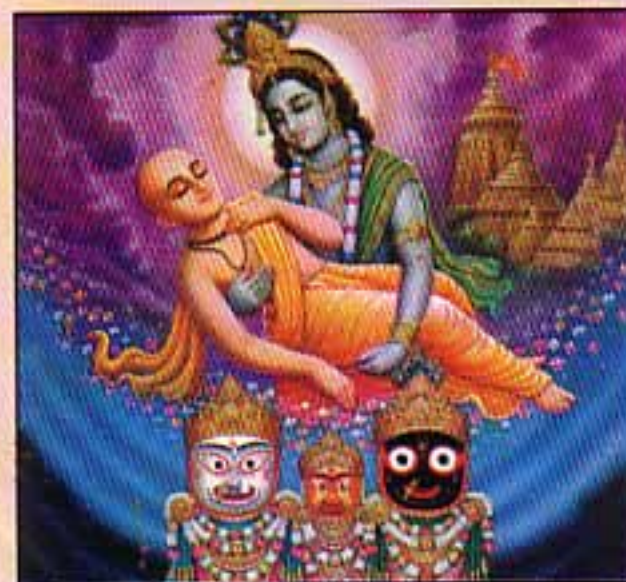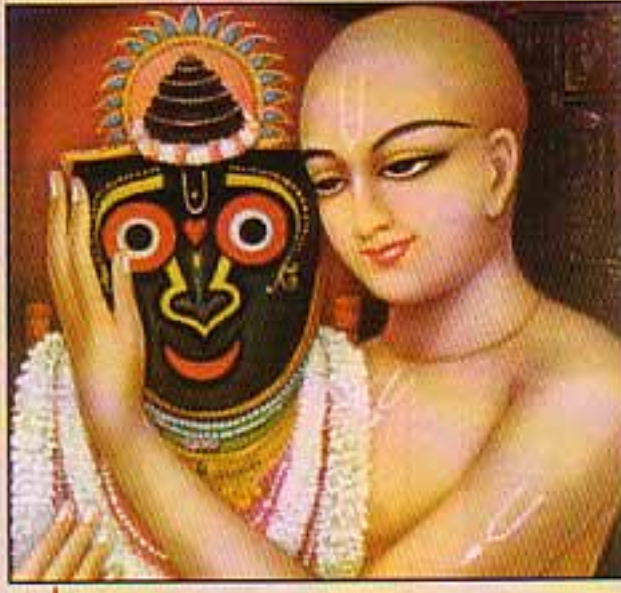
বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

ব্রাহ্মণ্যবাদ, মৌলবাদ ও সনাতন ধর্ম প্রসঙ্গ

– শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

(দ্বিতীয় পর্ব)

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের (হিন্দু অনুসৃত) সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজে গীতা যথাযথ অনুসারে কেউই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রেষ্ঠ নন; মানুষ শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন তার গুণ, কর্ম, যোগ্যতা কিংবা মেধা বলে। জ্ঞানী পুরুষ গৌতম বুদ্ধ (নবম অবতার হিসেবে মান্য) জন্মগত ব্রাহ্মণ্যপ্রথা সমর্থন করতেন না। ধর্মপদে তিনি ব্রাহ্মণের একাধিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর একটি সংজ্ঞা হল: **"আমি তাঁকেই বলি ব্রাহ্মণ, যিনি দণ্ড পরিহারপূর্বক দুর্বল এবং সবল সকল প্রাণীর প্রতি অহিংস আচরণ করেন এবং যিনি হত্যা করেন না বা হত্যার কারণও হন না।"** কৃষ্ণভক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির বলেছেন, **"যে শূদ্রে শম দমাদি লক্ষণ থাকে সে শূদ্র নয় – ব্রাহ্মণই; যে ব্রাহ্মণবংশীয়ের মধ্যে তা থাকে না সে ব্রাহ্মণ নয়, শুদ্রই।"** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, **"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, শুচি (ব্রাহ্মণ) হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে।"** ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, **"গুণগতভাবে যারা শ্রেষ্ঠ তথা ব্রাহ্মণ, তাঁদের প্রাধান্যই বস্তুত আমাদের সকলের কাম্য। গুণগত ব্রাহ্মণের সুস্পষ্ট প্রাধান্য যে সমাজে বিদ্যমান, সে সমাজই প্রকৃত বৈদিক সমাজ, ভদ্র কিংবা সভ্য সমাজ। এককথায় প্রকৃত সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজ।"** সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজে বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ্য প্রথার স্থান নেই, অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি কিংবা সামাজিক বৈষম্যের কোন স্থান নেই। এ সমাজের বৈশিষ্ট্য হল – গুণ ও স্বভাবজাত সামর্থ্য কিংবা যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত হবেন। যারা ব্রাহ্মণ তাঁরা হবেন জ্ঞানী, গুণী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, অদাম্ভিক, অমায়িক, অহিংসুক, পরহিতকামী ও সর্বভূতে সমদর্শী। এ বিষয়ে গীতা যথাযথে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হল – সমাজ সংস্কারের কথা বলে কিছু ব্যক্তি এ বিষয়টি কৌশলে বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, **"হিন্দু শব্দটির সাথে ধর্মীয় বোধ যুক্ত হয়েছে।"** কিন্তু সেটা কখন - কীভাবে এবং কার দ্বারা যুক্ত হয়েছে? তার যথার্থ ব্যাখ্যা কোথায়? ধর্মীয় ব্যাপারে কি কোন মনগড়া কথা বলা যায়? আসলে তিনি কেবল জাতি আর ধর্মকে গুলিয়ে ফেলেননি; তার সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও গুলিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। সমাজ সংস্কারে আন্তরিক হলে কি এ কাজ করতে পারতেন?

এখানে মৌলবাদ প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মৌলবাদ কথাটি বেশি দিনের পুরনো নয়। মূল থেকে 'মৌল' শব্দের উদ্ভব হলেও 'মৌলবাদ' আসলে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মতবাদ নয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলবাদ কথাটি ইংরেজি Fundamentalism এবং প্রতিশব্দ বলে গণ্য করা হয়। পাশ্চাত্য জগতে Fundamentalism শব্দটির উৎপত্তির মূলে রয়েছে খৃষ্টধর্মের এমন কিছু বিশ্বাস কিংবা তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতা, যা পরবর্তী সময়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়। কোন সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে; যা যার ভিত্তি নয় তাকেই তার ভিত্তি বলে ক্রমাগতভাবে প্রচার চালানোর কারণে। তবে ফান্ডামেন্টালিস্ট তথা মৌলবাদীরা কেবল প্রচার চালিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তারা যা বিশ্বাস করে বা মানে অন্যদেরকেও তা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করতে চায়। এ ক্ষেত্রে মৌলবাদীরা খুবই আপোষহীন ও অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। আসলে অসহিষ্ণুতা আর উগ্রতাই মৌলবাদী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা কেবল পশুপাখি নয়; নরহত্যা করতেও পিছপা হয় না। সত্য কথা বলতে কি – বর্তমান বিশ্বে হত্যা-সন্ত্রাস ও যুদ্ধবিগ্রহের বিস্তার ঘটে চলেছে অজ্ঞতার জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা উপলব্ধির অভাবে। ধর্ম রক্ষার নামে সর্বত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে উগ্রতা কিংবা অসহিষ্ণু চেতনার। অথচ অসহিষ্ণুতা মোটেই ধর্মের বিষয় নয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরূপ অসহিষ্ণু চেতনার ধারকদের ধর্মান্ধ তথা মোহাচ্ছন্ন বলে অভিহিত করেছেন। ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে তিনি এক ভাষণে এদের সম্পর্কে বলেছিলেন,

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে,
অন্ধ সেজন - মারে আর শুধু মরে।"

- আসলে অসহিষ্ণু চেতনার ধারক ধর্মান্ধরাই মৌলবাদী। বাড়াবাড়ি, মারামারি কিংবা সন্ত্রাস-সহিংসতা যে ধর্মের বিষয় নয় - তা তারা বুঝতে একেবারেই রাজি নয়। এদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনার সুরে তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতায় বলেছেন,

"হে ধর্মরাজ! ধর্মবিকার (বিকৃতি) নাশি,
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।"

- ধর্মমূঢ়জনেরা অল্পজ্ঞানী, মোহাচ্ছন্ন কিংবা ধর্মান্ধ (দ্রষ্টব্য : গীতা ৭/১৫)। আর বর্তমান বিশ্বেও ধর্মান্ধতা তথা অসহিষ্ণু চেতনাবাদ অর্থে মৌলবাদ কথাটি সর্বত্র প্রয়োগ হচ্ছে। পক্ষান্তরে ক্ষমা, দয়া-মায়া, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মানুষের ধর্মের মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত। তাই একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; মানবেতর প্রাণী পশুপাখির প্রতিও নির্দয় হতে পারেন না কিংবা নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন না। তিনি তাঁর জ্ঞানচক্ষুতে কেবল জীবের ক্ষণস্থায়ী দেহকে দেখেন না বরং দেখেন তার অবিনশ্বর আত্মাকে। জীবাত্মা ও নিজ আত্মা তাঁর কাছে অভিন্ন বলে বোধ হয়। পাঁচ হাজার বছর আগে পবিত্র গীতার মাধ্যমে এ তত্ত্বই জগতে প্রচারিত হয়েছিল।

কালের বিবর্তনে মানুষ তা ভুলে যাওয়ায় ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সেই পরম তত্ত্বই পুনঃপ্রচার শুরু করেন এবং এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তিনি মন্দির ও প্রচারকেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখন ধর্মের প্রচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইস্কনের সম্মানিত কৃষ্ণভক্তবৃন্দের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের সর্বত্র ঐকান্তিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা; সকলের নিরাপদে বসবাসের সুপরিবেশ নিশ্চিত করা।

বহু নাম অনেক সময় বহু সমস্যার কারণ হয়। অন্যক্ষেত্রে না হলেও ধর্মের নামের ক্ষেত্রে তাই অন্তত একটি নাম সর্বত্র প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে নামটি ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে এবং যে নাম বৈদিক সংস্কৃতির সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ও অবিতর্কিত, তা গ্রহণ করাই সমীচীন। এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। **হিন্দু শব্দের উল্লেখ কোন প্রাচীন গ্রন্থে নেই। শব্দটির সম্পর্ক ভৌগলিক অবস্থানের সাথে এবং এর প্রয়োগ 'জাতি' কিংবা 'সম্প্রদায়' অর্থে। ভারতে শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণরাও হিন্দু হিসেবে গণ্য হন। তবে সেটা হন তারা জাতি অর্থে। বাংলাদেশে 'হিন্দু' স্পষ্টতই একটি সম্প্রদায়। তাই বলে এ সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মের নাম 'হিন্দু' নয়। বৈদিক শাস্ত্রে এর কোন সমর্থন নেই। পুরাণে 'সনাতন' নামটিই উল্লেখ আছে। তাই এ নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম গ্রহণযোগ্য নয়। 'হিন্দু' শব্দটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং তা পশ্চিমাঞ্চলের আরবীয়দের দ্বারা আরোপিত। বিদেশীদের আরোপিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ শব্দকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যটা কী? সমাজের জন্মগত ভেদবৈষম্য বিলোপের পক্ষে কথা না বলে বৈদিক সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নামের পরিবর্তে ধর্মের নাম হিন্দু করণের জন্য বাড়াবাড়ির পেছনে কোন সৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে – নাকি এটা ব্রাহ্মণ্যবাদ বহাল রাখার কোন অপকৌশল? এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক।** ধর্মীয় ব্যাপারে জনমনে কোনরূপ সংশয় কিংবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া কখনোই উচিত নয়। এরূপ বিভ্রান্তি নিরসনের দায়িত্ব গুরু, সমাজ সংস্কারক অথবা প্রজ্ঞাবান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের। এখানে বলা দরকার যে, জটিল সমস্যা নিরসনে ইস্কনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং গভর্নিং বডির প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে। ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্তের তুলনায় পর্যালোচনামূলক যৌথ সিদ্ধান্ত অধিকতর নির্ভুল কিংবা সঠিক হয়। এ কথা বলতে গেলে সর্বজনস্বীকৃত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে এজন্যই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হচ্ছে। এ কারণে ইস্কনের সিদ্ধান্তও সবসময় সঠিক ও সমাজের স্বার্থের অনুকূল হচ্ছে। বিশ্বে ইস্কনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির এটা সবচেয়ে বড় কারণ। অন্যান্য সংঘ- সমিতি ও মঠ-মিশন এ ক্ষেত্রে ইস্কনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। তা করা হলে আমার মতে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে; বিশ্বে সন্ত্রাস-সহিংসতা বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহ ও নরহত্যা বন্ধের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। "হরে কৃষ্ণ"।

[৩৯ পৃষ্ঠার পর]

প্রশ্ন-৮। বাইরের পরিবেশ আদৌ কৃষ্ণভজনের উপযোগী নয়, এমতাবস্থায় কি করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কৃষ্ণভক্তিতে পরিচালিত করা যায়?

–শ্রী রাজিব ঘোষ, প্রযত্নে-শান্তি ভূষণ ঘোষ,
গ্রাম+পোঃ- পান্ডুঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা

উত্তর : বড় বড় আনন্দজনক অনুষ্ঠান– যেমন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, চন্দনযাত্রা, দোল পূর্ণিমা– এই সমস্ত উৎসবে ছেলে-মেয়েদের যুক্ত করানো, মঠ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া, ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করানো, ভক্ত ও ভগবানকে প্রণতি নিবেদন শেখানো উচিত। বড়দের অর্থাৎ পরিচালকদের অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে প্রতিদিন রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, তুলসী-শালগ্রাম, গৌর-নিতাই কিংবা জগন্নাথ-বলদেব সুভদ্রা– যে কোনও বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা ভোগ নিবেদন ও আরতি করা উচিত। রোজ ভগবানের মহাপ্রসাদ ছেলে-মেয়েদের ভোজন করানো, অপ্রসাদ এবং বাজারের আজেবাজে জিনিস খাওয়া যে আমাদের দেহ ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর তা শেখানো, প্রতিদিন নিজেরা এবং ছেলে-মেয়ে যাতে জপমালায় নির্দিষ্ট সংখ্যায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে তা লক্ষ্য রাখা, সুযোগ-সুবিধা হলে মাঝে মাঝে ভগবৎলীলা বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, প্রতিদিন সহজ সরল গল্পমূলক ভগবৎ-গ্রন্থ পাঠ, ভক্তিগীতি চর্চা, ভগবৎ বিষয়ক লীলাকাহিনী এবং চিত্রাবলীর মর্মার্থ বোঝানো কর্তব্য। ছেলে-মেয়েদের প্রতিবেশী সমবয়সীরা যাতে ভক্তিমূলক চর্চায় মনোনিবেশ করে, সেই জন্য তাদেরও উৎসাহ দান করা, ভগবানের জন্য ফুল তোলা, চন্দন ঘসা, পূজার বাসন মাজা, ধূপ ও দীপ জ্বালানো, খোল করতাল বাজানো, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে লতা-পাতা ফুল দিয়ে ভগবানের মঞ্চ সাজানো ইত্যাদি সেবায় ছেলে-মেয়েদের আদরের সঙ্গে নিযুক্ত করা, তাদের সকলকে নিয়ে কীর্তন করা অবশ্যই কর্তব্য।

কৃষ্ণভক্তি জিনিসটি আনন্দময়। তাই এতে কারও নিরুৎসাহিত হবার কথা নয়, তবে বড়দের ভক্তি-নিষ্ঠা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, প্রীতি-প্রেরণা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের অন্তরে ভক্তিময় চরিত্র লাভ করবার মানসিকতা জাগিয়ে তোলে।

প্রশ্ন-৯। এই জগতে কি আধ্যাত্মিক, কি আধিবৈদিক, কি আধিভৌতিক সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমরা জর্জরিত। আমাদের কর্মদোষে দুঃখলাভ করছি। সেই দুঃখ নিবৃত্তি কিভাবে সম্ভব হবে?

– মনপ্রিয়া বর্মণ, কালিয়া, নড়াইল।

উত্তর : আমরা আমাদের কর্মদোষে দুঃখ লাভ করছি। তাই কর্মদোষ এড়িয়ে চললে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হবে। শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলেছেন–

এতৎ সংসুচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥

"হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে যে, ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা।ঃ মানুষের সাংসারিক সমস্ত কর্ম যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয় তখন সেই সমস্ত কর্ম ত্রিতাপযুক্ত সংসার বন্ধনের কারণ সমূলে বিনাশ করে থাকে।

শ্রীনাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা

–শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীভগবান ও তাঁর নাম যে অভিন্ন তত্ত্ব– এক বস্তু, একথা শাস্ত্র অতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন। এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারলেও তদ্দ্বারা প্রবন্ধটিকে বৃথা ভারাক্রান্ত না করে সাধারণ পাঠকগণের সুখবোধের নিমিত্ত নাম ও নামীর অভেদাত্মক দুই একটি মাত্র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা–

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।
(হঃ ভঃ বিঃ -ধৃত ১১/৫০৩)

ইহার অর্থ ঃ চৈতন্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ এবং তাঁর নামের অভিন্নতা বশতঃ নামও চিন্তামণিস্বরূপ,–পূর্ণ শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত।

ইহার টীকায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন– নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বার্থদাতৃত্বাঃ। ন কেবলং তাদৃশসেব, অর্পিতু চৈতন্যলক্ষনো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। – ইহার অর্থ, – নামই চিন্তামণি। যেহেতু নাম সকল অর্থ প্রদান করতে সমর্থ। নামে যে কেবল সর্বার্থপ্রদাতৃত্ব শক্তিই আছে, তাহা নহে; চিদানন্দরস-বিশিষ্ট স্বাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই।

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীভগবান ও তাঁর নাম যে অভেদতত্ত্ব,–একথা শাস্ত্র সুস্পষ্টাক্ষরেই মায়ামুগ্ধ জীবকে জানিয়ে দিচ্ছেন।

কেবল শ্রীভগবান সম্বন্ধে নাম ও নামীই যে অভেদ-বস্তু তাহা নয়, শ্রীভগবান, তদীয় শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম– এই তিনই একবস্তু অভেদতত্ত্ব। তাই পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচরিতামৃতে লিখেছেন,–

নাম বিগ্রহ, স্বরূপ– তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ।। (২/১৭ অ)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপে শ্রীবিগ্রহে ও শ্রীনামে কোন ভেদ নাই, এই তিনই চিদানন্দময় ও একবস্তু।

সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্যস্বরূপ হইতেছে শাস্ত্রবাক্য। অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃত বিষয় নির্ণয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কিছুই নাই,– ইহা সুধীবৃন্দ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে। অতএব নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, ইহা যে অভিন্নতত্ত্ব,– একথা অভ্রান্ত সত্য।

তবে, এত বড় একটা মহাসত্যকে কেনই বা আমরা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারি না? এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হতে পারে। শ্রীভগবান হতে তাঁর শ্রীবিগ্রহাদিকে পৃথকরূপে ও শ্রীভগবান হতে তদীয় নামকে ভিন্নরূপে উপলব্ধি করবার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদেরকে একটু স্থিরচিত্তে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে।

শ্রীভগবান যেমন অপ্রাকৃত বস্তু,– সুতরাং চিন্ময় ও নির্গুণ (সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-রহিত) নাম ও নামীর এবং বিগ্রহ ও স্বরূপের (অভিন্নতা বশতঃ) নাম ও বিগ্রহ সেরূপ চিন্ময় ও অপ্রাকৃত বস্তু। অনাদি সংসারবদ্ধ জীবের চক্ষু, কর্ণ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্তই প্রাকৃত বা জড়ময়। জড়ময় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর স্বরূপ কখনই গ্রাহ্য হতে পারে না। অন্ধের সম্মুখে "রূপঃ, বধিরের নিকট "শব্দ" এবং রসনাহীন ব্যক্তির বদনে "রস" বিদ্যমান থাকলেও, তাদের পক্ষে যেমন সেই সেই বিষয় থেকেও না-থাকার মতোই বোধ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম– এই তিন এক হয়েও চিন্ময়তা প্রযুক্ত, অবিদ্যায় সংবদ্ধ জীবের জড়ময় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তার স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না। পারে না বলেই শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, তাদের পরিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তি ও মায়িক ইন্দ্রিয়াদির সমক্ষে ভিন্নাকারে উপলব্ধি হয়, এবং সেই কারণেই, যাঁর সত্ত্বায় জগতের অস্তিত্ব সেই পরম সত্য শ্রীভগবানকে 'নাই বলে এবং নিত্য অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামকে "সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র" বলে ভ্রম হয়ে থাকে। কেবল যে উক্ত বিষয়ত্রয় সম্বন্ধেই ভ্রম হয় তা নয়, শ্রীভগবানের ধামাদি চিচ্ছক্তির বিলাস মাত্রেই জীবের উক্ত প্রকার ভ্রম হয়ে থাকে জানতে হবে। অপ্রাকৃত বিষয়কেও প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করা ইহা অবিদ্যা-বিড়ম্বিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির স্বভাব বা স্বধর্ম। অন্ধের ধারণায় 'রূপ' না থাকলেও 'রূপ' পদার্থ যেমন সত্য বস্তু এবং তার সম্মুখে নিত্যই বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি চিদানন্দঘনমূর্তি শ্রীভগবান ও তদীয় নাম, বিগ্রহ ও ধামাদি চিদ্বিলাসসকল, সদা সর্বত্র স্বরূপেই বিদ্যমান থেকেও অপ্রাকৃত ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদির অভাব বশতঃ বদ্ধ জীবের নিকট মায়িক ও প্রাকৃত আকারেই প্রকাশিত। এই রহস্যটি বুঝবার জন্য তাই পরম পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :

– (১/৫/২০-২১)

চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা নিত্য লীলা রাস ॥

অঞ্জনাদি প্রয়োগদ্বারা যেমন অন্ধের অন্ধত্ব ক্রমশঃ অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের রূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পেতে থাকে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ দোষশূন্য হলে সেই নেত্র-সমক্ষেই যেমন সমস্ত জগতের স্বরূপ আবার ফুটে উঠে, সেরূপ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন ভক্তিরূপ চিন্ময়-অঞ্জনের প্রয়োগ জীবের অবিদ্যাদি দোষদুষ্ট মায়িক ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশঃ শুদ্ধ ও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হলেই শ্রীভগবান এবং তাঁর নাম, বিগ্রহ ও ধামাদির স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ-বিষয়ে শ্রীভগবানের নিজোক্তি যথা) (শ্রীভাঃ ১১/১৪/২৬)

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেহসৌ
মৎ পুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥

ইহার অর্থ : আমার পবিত্র কথা সকল শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত যেমন পরিমার্জিত হতে থাকে, অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করে, উহাও সেরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন করে থাকে।

সাধন ভক্তি দ্বারা যে পর্যন্ত না প্রেমোদয় হয়– যে পর্যন্ত শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, সেই পর্যন্ত জীবের অবিদ্যাকৃত ভ্রম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। সাধক, সাধন-ভক্তি দ্বারা যতই সাধ্যের সন্নিকটবর্তী হন, নাম ও নামীর অভিন্নতা অথবা শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের একত্ব, ততই অধিকতর রূপে তাঁর অনুভূতি হতে থাকে। এ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বর্ণপুরীতে ছিল এক রাজার কুমার। অন্য পারে, তালবনের শীতল কুঞ্জের ধারে– তাল পাতার ঘরে একটি হাসিরাশিভরা সুন্দর মেয়ে থাকতো। তার ধুলা মাটির পাতান খেলা ঘরের খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই একদিন সে শুনল, সেই সাত সাগরের পারের রাজকুমারের সঙ্গে অতি শৈশবে তার নাকি বিয়ে হয়েছিল, তারপর এ-পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। ভুলে যাওয়া স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির মতো সেই রাজার ছেলের কথা একটু একটু তার মনে পড়লো। অগ্নিকণা যেমন বেড়ে উঠে অগ্নিপুঞ্জ সৃজন করে, তেমনি সেই তরুণ রাজকুমারের স্মৃতির আগুন সেই তরুণীর সারা হৃদয় ছেয়ে ফেললো। প্রাণবল্লভের রাতুল চরণের সুখসম্মিলন আশায় কৃশাঙ্গিনী একান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে আবেগের সংবাদ বুঝি তার প্রিয়তমের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত করলো। তাই তার সারারাত লুকিয়ে কাঁদা রাঙ্গা চোখ দুটি মুছতে মুছতে– একদিন প্রভাতে সে যখন বাহিরে এসে দাঁড়াল, তরুণী দেখলো, আজ যথার্থই তার সুন্দর এক রাজদূত তার সেই অতি সুন্দর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে, আজ তাকে তার স্বামীর চরণতলে নিয়ে যেতে। তরুণী, সেই অতি বিশ্বাসী রাজদূতের অনুসরণ করে তার স্বামীর ঘরে চললো। রাজদুতকে দেখে, প্রথমে কেবল একজন হিতৈষীয় বান্ধব বলেই তার মনে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে যতই তার সঙ্গে যেতে লাগলো সে ততই তার গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল। তরুণী তার স্বামীর অশেষ গুণের কথা শুনেছিল, আজ এই রাজভৃত্যের গুণের পরিচয় পেয়ে তার সেই শুনা কথা প্রত্যক্ষর মতো বোধ হতে লাগলো। ক্রমে তার সঙ্গে একে একে নদ নদী সমুদ্র যতই পার হতে লাগলো সে, রাজপুত্রের স্বর্ণপুরী যতই সন্নিকট হয়ে আসতে লাগলো। তার, ততই সে রাজদূতের গুণে আত্মহারা হয়ে পড়লো। এখন শুধু আর গুণ নয়, রাজদূতের রূপ ও মাধুর্য তার কাছে অমৃতময় বোধ হতে লাগলো। হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই–এই অমৃতের মাঝে কি যেন এক হলাহলের ঝাপটা এসে তাকে শঙ্কায় ভরিয়ে দিলে, হৃদয়ের মাঝে যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সেই তরুণ রাজকুমারের রূপ, গুণ, মাধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে সে, কে এই রাজদূত– যার রূপ গুণ মাধুর্যের এত বিক্রম এতই সাহস যে সেই আসনের অর্ধাংশে বসবার দাবী করে। দুই পুরুষে সম অনুরাগ– কুলনারীর মরণ অপেক্ষা দুঃসহ। তাই সে ধৈর্যের বাঁধ অতি কষ্টে আরো উঁচু করে, স্বামীর অভয় চরণ দুখানি হৃদয়ে ধরবার জন্য শীঘ্র রাজদূতের সঙ্গে সেই স্বর্ণপুরীর মধ্যে ব্যাকুল প্রাণ নিয়ে প্রবেশ করল। রাজকুমারের মণিময় মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে, শেষে একবার রাজদূতের মুখপানে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে দেখতে তার সাধ জাগলো। সেই মুখখানি দেখামাত্র এবার তার ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙে গেলো। এত সুন্দর। এত মধুর। এত রূপ। – একি আমারই সেই প্রাণবল্লভ? এই কি সে অনুপম রাজকুমার? এই কথা তার মনে হতেই উল্লাসে– উদ্বেগে–উৎকণ্ঠায়, সংজ্ঞাহীন বালিকা তার অনুমিত রাজদূতের চরণতলে লুটিয়ে পড়লো। পরক্ষণে যেন কার আলিঙ্গনের মোহন স্পর্শ– তার মোহঘোর ভেঙে দিল। আঁখি মেলে চাইতেই দেখল সে, রত্ন সিংহাসনের উপর সেই পরমসুন্দর রাজদূত–আর সংবদ্ধা সে তাঁরই আবেগভরা আলিঙ্গনে। বিস্ময়ের ব্যাকুলতার তার শঙ্কিত আঁখি দুটি পুনরায় মুদে আসছে দেখে, তখন সেই সুন্দর তরুণ সহাস্যে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল– "রাজদূত নহি প্রিয়তমে,– আমিই সেই রাজার কুমার।"

আজ সকল সন্দেহের অবসান হয়ে গেলো। সজ্জিতা বালিকা আজ বুঝলো এতদিন রাজদূত বলে সে যাকে ভুল করেছিল– সেই তার হৃদয়-দেবতা– সেই তরুণ রাজপুত্র। আনন্দের পূর্ণ উৎসধারা ছুটলো তখন।

ঠিক সেইরূপ– সাধন অবস্থায় যাঁকে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে যাবার "দূতঃ রূপে– "সাধনা" রূপে–"নাম" রূপে মনে করা যায়, প্রাণবল্লভের চিন্তামণিময় শ্রীমন্দিরে উপনীত হওয়ামাত্র তদীয় দূতস্বরূপ সেই নাম তখন শ্রীভগবান রূপেই পরিণত হয়ে থাকেন। সেই অবস্থায়ই "সাধনা" "সাধ্য" হন, তখনই নাম ও নামী অভেদ রূপে উপলব্ধি হয়ে থাকেন। শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা–একই নিয়ম।

শ্রীভগবানের নাম যে একাধারে সাধ্য ও সাধনা– এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহৎদিগের প্রত্যক্ষ অনুভূতিও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। এ বিষয়ের বহু প্রমাণের মধ্যে এ স্থানে কেবল একটি মাত্র উদ্ধৃত করলাম যথা–

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসঙ্খ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ।।
–(পদ্যাবলী)

ইহার অর্থ : অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমুদয় চেতন পদার্থ যাঁর বিভূতির অংশ মাত্র, সেই তেজোময়

শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন।

অন্যের কথা ছেড়ে দিই; (কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীকেও পূর্বরাগে– সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনের অগ্রে, এই নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতার রহস্যজালে নিপতিতা হতে হয়েছিল। শ্রীরাধা তখনও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই; কেবল একদিন সুদূর কদম্বকানন হতে কারো এক সুমধুর বংশীধ্বনি এসে তাঁর শ্রুতিপথ স্পর্শ করেছিল। কিন্তু যেদিন বিশাখা সখী এক নবজলধরস্নিগ্ধদ্যুতি নবকিশোরের চিত্রপট এনে তাঁকে দেখালেন সেই দিন হতে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিমনা ও বিষাদযুক্তা হলেন। ললিতাদি সখীগণ তাঁর অকস্মাৎ এরূপ মনোবেদনার কারণ জানবার জন্য ব্যাকুলভাবে বারম্বার অনুরোধ করায় নতমুখী শ্রীরাধা সজলনয়নে ও সলজ্জভাবে সখীদিগকে যাহা বললেন– পরম রসিক ভক্তশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকে তা অতি **সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, যথা,–**

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী।।

ভক্ত কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ দাস-কৃত ইহারই উপযুক্ত সুমধুর পদ্যানুবাদটি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করলাম,–

সজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি–
জীবন কিএ সুখ লাগি ॥ ধ্রু ॥

পহিলে শুনলু হম "শ্যামা" দুই আঁখর
তৈখনি মন চুরি কেল। (নাম)

না জানিএ কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল।। (স্বরূপ)

না জানিএ কো ঐছে পটে দরশায়লি
নবজলধর জিনি কাঁতি। (বিগ্রহ)

চকতি হইয়া হম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি ॥

গোবিন্দদাস কহয়ে, শুন শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।

যা কর নাম, মুরলীরব তা কর,
পটে ভেল সো পরকাশ ॥

যাহা স্বরূপ ও বিগ্রহে অভেদ,– যাহা নামী ও নামে অভিন্ন,–এমন শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম আমাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকতে ভবভয়ে আমাদের ভয় কি? অবিদ্যার ঘন কুয়াশায় আপাততঃ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহাদির স্বরূপোপলব্ধি না হলেও,– ধর ভাই কলিগ্রস্ত জীব।– এই দুটি "সাধন" রূপে হাতে পাওয়া "সাধ্য" বস্তুকে ভীষণ ভবার্ণব মাঝে বুকে করে ধর। সর্বানর্থ নিবর্তনের ও সর্বানন্দ আস্বাদনের ইহা হতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। ভাই সব। কলিচরের প্রতারণা হতে সাবধান হও, ঐ যে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে– ঐ যে নিভৃত পল্লীর বুকে, শত শত শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্তিরূপে– জগৎ মঙ্গল ঐ যিনি বিরাজ করছেন,– তিনি দারু নয়– শিলা নয়– ধাতু নয়, তিনিই সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি,–অনন্ত বিশ্ব যাঁর অনন্ত বিভূতির কণ মাত্র। অনন্ত রূপে করুণার বশে, স্বরূপ হতে অভিন্ন–শ্রীবিগ্রহ তোমাদের ঘরে ঘরে প্রকাশিত তিনি। আবার আরও সুলভ হয়ে–সর্ব ভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য হয়ে, জগৎ মঙ্গল "শ্রীনাম" রূপে জগতে আবির্ভূত যিনি, তিনি শক্তিহীন শব্দ বা বর্ণ মাত্র নয়, – তিনি সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি। ধর বুকে নাম, কর মুখে নাম!– হেলায়, শ্রদ্ধায় যে ভাবেই হোক, "নামময়" হয়ে থাকতে পারবে যে–তাকে হরিময় বলে জানতে হবে। হরিময় যে,–তার কিসের দুঃখ– কিসের ভয়– কিসের ভাবনা।

কলির প্রবঞ্চনায়, জাতীয়ভাব-বিসর্জিত মানবের নিকট আজ শ্রীবিগ্রহ, কাষ্ঠ-পাষাণাদি রূপে যতই অবজ্ঞাত হচ্ছেন, শ্রীনাম, শক্তিহীন শব্দমাত্র রূপে যতই উপেক্ষিত হচ্ছেন, ব্যক্তিগত অমঙ্গল,–জাতিগত অমঙ্গল–দেশগত অমঙ্গল–জগৎ গত অমঙ্গল দিন দিন ততই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। "সেবাপরাধ" ও "নামাপরাধ" রূপ বিঘ্ন বাতাসের সংযোগ হচ্ছে অনর্থ, অশান্তি ও অমঙ্গলরূপ দীপ্ত বহ্নির উদ্ভব। আবার যদি ভক্তিভরে ভগ্ন দেবালয় সুসংস্কৃত হয় আবার যদি অবজ্ঞাত দেবতার সংবর্ধনা স্বরূপ সকাল-সন্ধ্যায়, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের মঙ্গলধ্বনি মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠে, আবার যদি জয় জয় রবে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের প্রেমোপহারে শ্রীমূর্তি মহা সমাদরে অর্চিত হয়, তবেই এই অনর্থের অব্যাহতির সম্ভাবনা।

আবার যদি কোটিকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনাম ধ্বনিত হয়ে উঠে, কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয় বশতঃ আবার যদি খোল-করতালের মেঘমন্দ্রের সহিত শ্রীহরিনামের মহা-সঙ্কীর্তনে সর্বদেশ–গ্রাম-পল্লী মুখরিত হয়, আবার যদি সুবুদ্ধিযোগ বশতঃ জনে জনে নিরপরাধে নামাশ্রয় করে, তবেই আবার সর্বানর্থ-নিবৃত্তি ও সর্বার্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যাঁরা বলেন, উক্ত পথে চলিয়াই, বর্তমানে দেশ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত, তাঁদেরই দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মনোবৃত্তির জন্য সত্য সত্যই আমরা পরিতাপ করিতেছি। এই পরম শুভকর পথে চলিয়াই দেশ দুর্দশাগর্তে নিপতিত হয় নাই, স্বভাবোচিত স্বধর্মপথ হতে ক্রমশঃ পরিভ্রষ্ট হয়েই দেশ আজ দুর্দশার কন্টকারণ্যে বিড়ম্বিত। আজ যে আমরা নানাভাবে বিপদগ্রস্ত, স্মরণ রাখতে হবে, স্বভাব বা 'স্বপদ' হতে পরিভ্রষ্টতার নামই 'বিপদ'।

নামাশ্রয়িগণের পবিত্র পদরজের বন্দনা করে, পুণ্য হরিধ্বনির সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎ পুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥

ইহার অর্থ : আমার পবিত্র কথা সকল শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত যেমন পরিমার্জিত হতে থাকে, অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করে, উহাও সেরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন করে থাকে।

সাধন ভক্তি দ্বারা যে পর্যন্ত না প্রেমোদয় হয়– যে পর্যন্ত শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না, সেই পর্যন্ত জীবের অবিদ্যাকৃত ভ্রম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না। সাধক, সাধন-ভক্তি দ্বারা যতই সাধ্যের সন্নিকটবর্তী হন, নাম ও নামীর অভিন্নতা অথবা শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের একত্ব, ততই অধিকতর রূপে তাঁর অনুভূতি হতে থাকে। এ-সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো।

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বর্ণপুরীতে ছিল এক রাজার কুমার। অন্য পারে, তালবনের শীতল কুঞ্জের ধারে– তাল পাতার ঘরে একটি হাসিরাশিভরা সুন্দর মেয়ে থাকতো। তার ধুলা মাটির পাতান খেলা ঘরের খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই একদিন সে শুনল, সেই সাত সাগরের পারের রাজকুমারের সঙ্গে অতি শৈশবে তার নাকি বিয়ে হয়েছিল, তারপর এ-পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। ভুলে যাওয়া স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির মতো সেই রাজার ছেলের কথা একটু একটু তার মনে পড়লো। অগ্নিকণা যেমন বেড়ে উঠে অগ্নিপুঞ্জ সৃজন করে, তেমনি সেই তরুণ রাজকুমারের স্মৃতির আগুন সেই তরুণীর সারা হৃদয় ছেয়ে ফেললো। প্রাণবল্লভের রাতুল চরণের সুখসম্মিলন আশায় কৃশাঙ্গিনী একান্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সে আবেগের সংবাদ বুঝি তার প্রিয়তমের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত করলো। তাই তার সারারাত লুকিয়ে কাঁদা রাঙা চোখ দুটি মুছতে মুছতে– একদিন প্রভাতে সে যখন বাহিরে এসে দাঁড়াল, তরুণী দেখলো, আজ যথার্থই তার সুন্দর এক রাজদূত তার সেই অতি সুন্দর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে, আজ তাকে তার স্বামীর চরণতলে নিয়ে যেতে। তরুণী, সেই অতি বিশ্বাসী রাজদূতের অনুসরণ করে তার স্বামীর ঘরে চললো। রাজদুতকে দেখে, প্রথমে কেবল একজন হিতৈষীয় বান্ধব বলেই তার মনে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে যতই তার সঙ্গে যেতে লাগলো সে ততই তার গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল। তরুণী তার স্বামীর অশেষ গুণের কথা শুনেছিল, আজ এই রাজভৃত্যের গুণের পরিচয় পেয়ে তার সেই শুনা কথা প্রত্যক্ষর মতো বোধ হতে লাগলো। ক্রমে তার সঙ্গে একে একে নদ নদী সমুদ্র যতই পার হতে লাগলো সে, রাজপুত্রের স্বর্ণপুরী যতই সন্নিকট হয়ে আসতে লাগলো। তার, ততই সে রাজদূতের গুণে আত্মহারা হয়ে পড়লো। এখন শুধু আর গুণ নয়, রাজদূতের রূপ ও মাধুর্য তার কাছে অমৃতময় বোধ হতে লাগলো। হঠাৎ চমক ভাঙ্গতেই–এই অমৃতের মাঝে কি যেন এক হলাহলের ঝাপটা এসে তাকে শঙ্কায় ভরিয়ে দিলে, হৃদয়ের মাঝে যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সেই তরুণ রাজকুমারের রূপ, গুণ, মাধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে সে, কে এই রাজদূত– যার রূপ গুণ মাধুর্যের এত বিক্রম এতই সাহস যে সেই আসনের অর্ধাংশে বসবার দাবী করে। দুই পুরুষে সম অনুরাগ– কুলনারীর মরণ অপেক্ষা দুঃসহ। তাই সে ধৈর্যের বাঁধ অতি কষ্টে আরো উঁচু করে, স্বামীর অভয় চরণ দুখানি হৃদয়ে ধরবার জন্য শীঘ্র রাজদূতের সঙ্গে সেই স্বর্ণপুরীর মধ্যে ব্যাকুল প্রাণ নিয়ে প্রবেশ করল। রাজকুমারের মণিময় মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে, শেষে একবার রাজদূতের মুখপানে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে দেখতে তার সাধ জাগলো। সেই মুখখানি দেখামাত্র এবার তার ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙে গেলো। এত সুন্দর। এত মধুর। এত রূপ। – একি আমারই সেই প্রাণবল্লভ? এই কি সে অনুপম রাজকুমার? এই কথা তার মনে হতেই উল্লাসে– উদ্বেগে–উৎকণ্ঠায়, সংজ্ঞাহীন বালিকা তার অনুমিত রাজদূতের চরণতলে লুটিয়ে পড়লো। পরক্ষণে যেন কার আলিঙ্গনের মোহন স্পর্শ– তার মোহঘোর ভেঙে দিল। আঁখি মেলে চাইতেই দেখল সে, রত্ন সিংহাসনের উপর সেই পরমসুন্দর রাজদূত–আর সংবদ্ধা সে তাঁরই আবেগভরা আলিঙ্গনে। বিস্ময়ের ব্যাকুলতার তার শঙ্কিত আঁখি দুটি পুনরায় মুদে আসছে দেখে, তখন সেই সুন্দর তরুণ সহাস্যে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল– "রাজদূত নহি প্রিয়তমে,– আমিই সেই রাজার কুমার।"

আজ সকল সন্দেহের অবসান হয়ে গেলো। সজ্জিতা বালিকা আজ বুঝলো এতদিন রাজদূত বলে সে যাকে ভুল করেছিল– সেই তার হৃদয়-দেবতা– সেই তরুণ রাজপুত্র। আনন্দের পূর্ণ উৎসধারা ছুটলো তখন।

ঠিক সেইরূপ– সাধন অবস্থায় যাঁকে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে যাবার "দূতঃ রূপে– "সাধনা" রূপে–"নাম" রূপে মনে করা যায়, প্রাণবল্লভের চিন্তামণিময় শ্রীমন্দিরে উপনীত হওয়ামাত্র তদীয় দূতস্বরূপ সেই নাম তখন শ্রীভগবান রূপেই পরিণত হয়ে থাকেন। সেই অবস্থায়ই "সাধনা" "সাধ্য" হন, তখনই নাম ও নামী অভেদ রূপে উপলব্ধি হয়ে থাকেন। শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা–একই নিয়ম।

শ্রীভগবানের নাম যে একাধারে সাধ্য ও সাধনা– এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহৎদিগের প্রত্যক্ষ অনুভূতিও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। এ বিষয়ের বহু প্রমাণের মধ্যে এ স্থানে কেবল একটি মাত্র উদ্ধৃত করলাম যথা–

ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিসঙ্খ্যাধিকানা-
মৈশ্বর্য্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ।
আবির্ভূতং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ।।
–(পদ্যাবলী)

ইহার অর্থ : অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমুদয় চেতন পদার্থ যাঁর বিভূতির অংশ মাত্র, সেই তেজোময়

শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ নামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবন।

অন্যের কথা ছেড়ে দিই; (কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীকেও পূর্বরাগে– সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনের অগ্রে, এই নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতার রহস্যজালে নিপতিতা হতে হয়েছিল। শ্রীরাধা তখনও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই; কেবল একদিন সুদূর কদম্বকানন হতে কারো এক সুমধুর বংশীধ্বনি এসে তাঁর শ্রুতিপথ স্পর্শ করেছিল। কিন্তু যেদিন বিশাখা সখী এক নবজলধরস্নিগ্ধদ্যুতি নবকিশোরের চিত্রপট এনে তাঁকে দেখালেন সেই দিন হতে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিমনা ও বিষাদযুক্তা হলেন। ললিতাদি সখীগণ তাঁর অকস্মাৎ এরূপ মনোবেদনার কারণ জানবার জন্য ব্যাকুলভাবে বারম্বার অনুরোধ করায় নতমুখী শ্রীরাধা সজলনয়নে ও সলজ্জভাবে সখীদিগকে যাহা বললেন– পরম রসিক ভক্তশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকে তা অতি **সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, যথা,–**

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্।
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ।
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী।।

ভক্ত কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ দাস-কৃত ইহারই উপযুক্ত সুমধুর পদ্যানুবাদটি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করলাম,–

সজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি–
জীবন কিএ সুখ লাগি ॥ ধ্রু ॥

পহিলে শুনলু হম "শ্যামা" দুই আঁখর
তৈখনি মন চুরি কেল। (নাম)
না জানিএ কো ঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল।। (স্বরূপ)
না জানিএ কো ঐছে পটে দরশায়লি
নবজলধর জিনি কাঁতি। (বিগ্রহ)
চকতি হইয়া হম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে, শুন শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যা কর নাম, মুরলীরব তা কর,
পটে ভেল সো পরকাশ ॥

যাহা স্বরূপ ও বিগ্রহে অভেদ,– যাহা নামী ও নামে অভিন্ন,–এমন শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম আমাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকতে ভবভয়ে আমাদের ভয় কি? অবিদ্যার ঘন কুয়াশায় আপাততঃ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহাদির স্বরূপোলব্ধি না হলেও,– ধর ভাই কলিগ্রস্ত জীব।– এই দুটি "সাধন" রূপে হাতে পাওয়া "সাধ্য" বস্তুকে ভীষণ ভবার্ণব মাঝে বুকে করে ধর। সর্বানর্থ নিবর্তনের ও সর্বানন্দ আস্বাদনের ইহা হতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। ভাই সব। কলিচরের প্রতারণা হতে সাবধান হও, ঐ যে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে– ঐ যে নিভৃত পল্লীর বুকে, শত শত শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্তিরূপে– জগৎ মঙ্গল ঐ যিনি বিরাজ করছেন,– তিনি দারু নয়– শিলা নয়– ধাতু নয়, তিনিই সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি,–অনন্ত বিশ্ব যাঁর অনন্ত বিভূতির কণ মাত্র। অনন্ত রূপে করুণার বশে, স্বরূপ হতে অভিন্ন–শ্রীবিগ্রহ তোমাদের ঘরে ঘরে প্রকাশিত তিনি। আবার আরও সুলভ হয়ে–সর্ব ভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য হয়ে, জগৎ মঙ্গল "শ্রীনাম" রূপে জগতে আবির্ভূত যিনি, তিনি শক্তিহীন শব্দ বা বর্ণ মাত্র নয়, – তিনি সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি। ধর বুকে নাম, কর মুখে নাম!– হেলায়, শ্রদ্ধায় যে ভাবেই হোক, "নামময়" হয়ে থাকতে পারবে যে–তাকে হরিময় বলে জানতে হবে। হরিময় যে,–তার কিসের দুঃখ– কিসের ভয়– কিসের ভাবনা।

কলির প্রবঞ্চনায়, জাতীয়ভাব-বিসর্জিত মানবের নিকট আজ শ্রীবিগ্রহ, কাষ্ঠ-পাষাণাদি রূপে যতই অবজ্ঞাত হচ্ছেন, শ্রীনাম, শক্তিহীন শব্দমাত্র রূপে যতই উপেক্ষিত হচ্ছেন, ব্যক্তিগত অমঙ্গল,–জাতিগত অমঙ্গল–দেশগত অমঙ্গল–জগৎ গত অমঙ্গল দিন দিন ততই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। "সেবাপরাধ" ও "নামাপরাধ" রূপ বিঘ্ন বাতাসের সংযোগ হচ্ছে অনর্থ, অশান্তি ও অমঙ্গলরূপ দীপ্ত বহ্নির উদ্ভব। আবার যদি ভক্তিভরে ভগ্ন দেবালয় সুসংস্কৃত হয় আবার যদি অবজ্ঞাত দেবতার সংবর্ধনা স্বরূপ সকাল-সন্ধ্যায়, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের মঙ্গলধ্বনি মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠে, আবার যদি জয় জয় রবে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের প্রেমোপহারে শ্রীমূর্তি মহা সমাদরে অর্চিত হয়, তবেই এই অনর্থের অব্যাহতির সম্ভাবনা।

আবার যদি কোটিকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনাম ধ্বনিত হয়ে উঠে, কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয় বশতঃ আবার যদি খোল-করতালের মেঘমন্দ্রের সহিত শ্রীহরিনামের মহা-সঙ্কীর্তনে সর্বদেশ-গ্রাম-পল্লী মুখরিত হয়, আবার যদি সুবুদ্ধিযোগ বশতঃ জনে জনে নিরপরাধে নামাশ্রয় করে, তবেই আবার সর্বানর্থ-নিবৃত্তি ও সর্বার্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যাঁরা বলেন, উক্ত পথে চলিয়াই, বর্তমানে দেশ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত, তাঁদেরই দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মনোবৃত্তির জন্য সত্য সত্যই আমরা পরিতাপ করিতেছি। এই পরম শুভকর পথে চলিয়াই দেশ দুর্দশাগর্তে নিপতিত হয় নাই, স্বভাবোচিত স্বধর্মপথ হতে ক্রমশঃ পরিভ্রষ্ট হয়েই দেশ আজ দুর্দশার কন্টকারণ্যে বিড়ম্বিত। আজ যে আমরা নানাভাবে বিপদগ্রস্ত, স্মরণ রাখতে হবে, স্বভাব বা 'স্বপদ' হতে পরিভ্রষ্টতার নামই 'বিপদ'।

নামাশ্রয়িগণের পবিত্র পদরজের বন্দনা করে, পুণ্য হরিধ্বনির সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিকৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্য উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে–

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

[পূর্ব প্রকাশের পর]

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

শ্লোক ১০

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১০ ॥

তদা– সেই সময়ে; তৎ – তা; অহম্ – আমি; ঈশস্য – ভগবানের; ভক্তানাম্ – ভক্তদের; শম – কৃপা; অভীপ্সতঃ – ইচ্ছা করেছিল; অনুগ্রহম্ – বিশেষ কৃপা; মন্যমানঃ – সেইভাবে চিন্তা করে; প্রাতিষ্ঠম্ – যাত্রা করি; দিশম্ উত্তরাম্ – উত্তর দিকে।

অনুবাদ

সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা সব কিছুকেই ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে যা দুঃখদায়ক অথবা বিপজ্জনক, ভক্ত তাকে ভগাবনের বিশেষ করুণা বলে গ্রহণ করেন। জাগতিক উন্নতি এক ধরনের জড় রোগ, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই রোগের তাপ ধীরে ধীরে উপমশ হয় এবং পারমার্থিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। জড়বাদী মানুষেরা তা বুঝতে পারে না।

শ্লোক ১১

স্ফীতাঞ্জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্বটবাটীশ্চ বনান্যুপবনানি-চ ॥১১॥

স্ফীতান – অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী; জন-পদান্ – জনপদ; তত্র – সেখানে; পুর – নগর; গ্রাম – গ্রাম; ব্রজ – বড় খামার; আকরান্ – খনি; খেট – ক্ষেত; খর্বট – উপত্যকা; বাটীঃ – ফুলের বাগান; চ– এবং; বনানি – বন; উপবনানি – উপবন; চ – এবং।

অনুবাদ

গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম।

তাৎপর্য

কৃষি, খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, পশুপালন, ফুলের চাষ ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ এখনকার মতো পূর্বেও ছিল, এমন কি বর্তমান সৃষ্টির আগেও তা ছিল এবং পরবর্তী সৃষ্টিতেও সে সমস্ত কার্যকলাপগুলি থাকবে। প্রকৃতির নিয়মে বহু লক্ষ লক্ষ বছর পরে আবার সৃষ্টির শুরু হয় এবং প্রায় একই রকমভাবে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। জড়বাদীরা জীবনের যথার্থ প্রয়োজনগুলির অনুসন্ধান না করে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ইত্যাদির প্রচেষ্টায় তাদের সময়ের অপচয় করে। নারদ মুনি যদিও তখন একটি শিশু ছিলেন কিন্তু পারমার্থিক জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া মাত্রই তিনি আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি অনর্থক কার্যকলাপে এক মুহূর্তও নষ্ট না করে পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদিও তিনি নগরী, গ্রাম, খনি এবং সমৃদ্ধ জনপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের কোন রকম প্রয়াস তিনি করেননি। তিনি কেবল তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের ঘটনার ইতিহাস। সে কথা এখানে বলা হয়েছে, ইতিহাসের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই কেবল এই অপ্রাকৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীনিভভগ্নভুজদ্রুমান্।
জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনীঃ সুরসেবিতাঃ।
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈর্বিভ্রমদ্‌ভ্রমরশ্রিয়ঃ ॥১২॥

ত্রিধাতু – স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র আদি মূল্যবান ধাতু; বিচিত্র – বিচিত্র; অদ্রীন্ – পাহাড় এবং পর্বত; ইভভগ্ন – বৃহদাকার হস্তী দ্বারা বিধ্বস্ত; ভুজ – শাখা; দ্রুমান্ – গাছপালা; জলাশয়ান্-শিব – স্বাস্থ্যকর; জলান্ – জলাশয়; নলিনীঃ – পদ্মফুল; সুর-সেবিতাঃ – স্বর্গের দেবতাদের দ্বারা সেবিত; চিত্রস্বনৈঃ – চিত্তাকর্ষক; পত্র-রথৈঃ – পাখিদের দ্বারা; বিভ্রমৎ – বিভ্রান্তকারী; ভ্রমর-শ্রিয়ঃ – ভ্রমরদের দ্বারা অলঙ্কৃত।

অনুবাদ

আমি স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলকৃত স্বর্গের দেবতাদের উপযুক্ত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলাম।

শ্লোক ১৩

নলবেণুশরস্তন্বকুশকীচকগহ্বরম্
এক এবাতিয়াতোহহমদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ।
ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলূকশিবাজিরম্ ॥১৩॥

নল – নল; বেণু – বাঁশ; শরঃ – শর; তন্ব – পূর্ণ; কুশ – কুশ ঘাস; কীচক – লতাগুল্ম; গহ্বরম্ – গুহা; এক – একলা; এব – কেবল; অতিয়াতঃ – দুর্গম; অহম – আমি; অদ্রাক্ষম্ – গমন করেছিলাম; বিপিনম্ – গভীর অরণ্য; মহৎ; – মহৎ; ঘোরম – ভয়ঙ্কর; প্রতিভয়াকারম্ – ভীষণ ভীতিজনক; ব্যাল – সর্প; উলুক – পেঁচা; শিব– শৃগাল; অজিরম্ – বিচরণক্ষেত্র।

অনুবাদ

তারপর আমি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র।

তাৎপর্য

পরিব্রাজকাচার্যদের কর্তব্য হচ্ছে বন, অরণ্য, পাহাড়, পর্বত, নগর, গ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একাকী ভ্রমণ করে ভগবানের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা অর্জন করা, যাতে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং মনের বল অর্জন করা যায় এবং সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করা যায়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে নির্ভয়ে এই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা, এবং বর্তমান যুগের আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি মধ্য ভারতের ঝারিখণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গমন করে সেখানকার বাঘ, ভাল্লুক, সাপ হরিণ, হাতি এবং অন্যান্য বহু বন্য জন্তুকে ভগবৎ-প্রেম দান করেছিলেন। এই কলিযুগে সাধারণ মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিষেধ। যে মানুষ লোক দেখাবার জন্য কেবল বেশ পরিবর্তন করে, সে আদর্শ সন্ন্যাসী থেকে ভিন্ন। আদর্শ সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি সব রকমের জড় আদান-প্রদান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে তাঁর জীবন সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করেন। বেশ পরিবর্তন কেবল একটি বাহ্যিক রীতি মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সন্ন্যাসের নাম গ্রহণ করেননি। এই কলিযুগে তথাকথিত সন্ন্যাসীদেরও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের পূর্বের নাম পরিবর্তন করা উচিত নয়। এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনরূপ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই হচ্ছে একমাত্র অনুমোদিত পন্থা, এবং যিনি সংসার ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তাঁকে নারদ মুনি অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো পরিব্রাজকাচার্যদের অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে, তিনি কোনও পবিত্র স্থানে স্থিত হয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সময় বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের মতো মহান আচার্যদের লেখা পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যয়নে নিয়োজিত করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্‌পরীতো বুভুক্ষিতঃ।
স্নাত্বা পীত্বা হ্রদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো গতশ্রমঃ ॥১৪॥

পরিশ্রান্ত– শ্রান্ত হয়ে; ইন্দ্রিয় – দৈহিক; আত্মা – মানসিক; অহম্ – আমি; তৃট্‌পরীতঃ – তৃষ্ণার্ত হয়ে; বুভুক্ষিতঃ – ক্ষুধার্ত হয়ে; স্নাত্বা – স্নান করে; পীত্বা – পান করে; হ্রদে – হ্রদে; নদ্যাঃ – নদীতে; উপস্পৃষ্টঃ – সংস্পর্শে; গত – দূর হয়েছিল; শ্রমঃ – শ্রম।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম।

তাৎপর্য

পরিব্রাজককে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আদি দেহের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় না। প্রকৃতির দানের মাধ্যমেই তা মেটানো যায়। তাই পরিব্রাজক গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করার জন্য যান না, তাদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করার জন্য যান।

শ্লোক ১৫

তস্মিন্নির্মনুজেহরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।
আত্মনাত্মানমাত্মস্থং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥১৫॥

তস্মিন্ – সেই; নির্মনুজে – লোকবসতিবিহীন; অরণ্যে – অরণ্যে; পিপ্পল – অশ্বত্থ বৃক্ষ; উপস্থ – উপবেশন করে; আশ্রিতঃ – আশ্রয় গ্রহণ করে; আত্মনা – বুদ্ধির দ্বারা; আত্মানম্ – পরমাত্মাকে; আত্মস্থম্ – আমার, অন্তরে অবস্থিত; যথাশ্রুতম্ – যে ভাবে আমি সেই মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম; অচিন্তয়ম্ – চিন্তা করেছিলাম।

অনুবাদ

তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম।

তাৎপর্য

ধ্যান নিজের ইচ্ছামত করা যায় না। সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে যোগের পন্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়ে এবং বুদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন যে পরমাত্মা তাঁর ধ্যান করতে হয়। যে ভক্ত তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রীতিপূর্বক ভগবানের সেবা করেছেন, তাঁর মধ্যে এই চেতনা সুদৃঢ়ভাবে বিকশিত হয়। শ্রীনারদ মুনি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়েছিলেন, নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তার ফলে যথাযথভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এভাবেই তিনি ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন।

[চলবে]

"কৃষ্ণ" আনন্দের আধার

এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত
KIRSHNA-THE RESERVOIR OF PLEASURE গ্রন্থ থেকে অনূদিত
অনুবাদক – মিনাক্ষী দেবী দাসী

কৃষ্ণ শব্দটি-অতীন্দ্রিয়, তুরীয়, মনুষ্যজ্ঞানের অতীত এবং অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ অর্থ-সর্বোচ্চ আনন্দ। আমাদের প্রত্যেকেই, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীই আনন্দ চায়। কিন্তু আমরা জানি না কি করে সঠিকভাবে আনন্দ পাওয়া যায়। জীবনের জাগতিক ধারণা নিয়ে-আমরা আমাদের আনন্দের পরিতৃপ্তি পাবার প্রতিটি স্তরে ব্যর্থ আর হতাশাচ্ছন্ন হচ্ছি-কারণ আমাদের কাছে সেই সর্বোচ্চস্তর সম্বন্ধে কোনো তথ্য নেই। যেখানে রয়েছে সত্যিকারের আনন্দ-পরিপূর্ণ আনন্দ। সত্যিকারের আনন্দ ভোগ করতে হলে, কোনো ব্যক্তিকে প্রথমেই এটা বুঝতে হবে যে- সে এই দেহ নয়, আত্মা বা চেতনা। শুধুমাত্র ধারণা বা চেতনা নয়-এই চেতনা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত পরিচয়ের লক্ষণ- আমরা হচ্ছি শুদ্ধ আত্মা, যা এখন এই জড় বস্তু দিয়ে তৈরি দেহের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে। আধুনিক জাগতিক বিজ্ঞান এক্ষেত্রে কোনো চাপ দেয় না বা গুরুত্ব প্রদান করে না। যার কারণে বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে শুদ্ধ আত্মা সম্পর্কে তাদের ধারণাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কিন্তু শক্তিশালী আত্মা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা যে কোনো ব্যক্তি তার চেতনার উপস্থিতিতে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। যে কোনো শিশুও বুঝতে পারে যে, চেতনা বা অনুভূতিই হচ্ছে শক্তিমান আত্মার উপস্থিতির লক্ষণ।

এখন আমরা কিভাবে এই চেতনার স্তরে আসি সেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা থেকে যা কিনা ভগবান কর্তৃক গীত হয়েছে, আমরা যদি সেই চেতন আত্মার স্তর থেকে কাজ করি তবে আমরা এই দেহাত্ম বুদ্ধির মধ্যে পুনরায় পতিত নাও হতে পারি। তখন এই দেহের অবসানে জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারব। এই দেহ ত্যাগ করার পর আমাদের থাকবে পূর্ণ ও নিত্য আধ্যাত্মিক জীবন। আত্মা বা শক্তি যা সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম তা হচ্ছে নিত্য; সনাতন।

এমনকি এই দেহের অবসানে বা দেহ ধ্বংস হয়ে যাবার পরও আত্মা ধ্বংস হয় না বরং আত্মা অন্য এক শরীরে স্থানান্তরিত হয় এবং পুনরায় জড় জাগতিক জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ করে তোলে। এই বিষয়েও ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা রয়েছে। মৃত্যুর সময় আমাদের চিন্তা বা চেতনা যদি শুদ্ধ থাকে তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের পরবর্তী জীবন জাগতিক হবে না, আমাদের পরবর্তী জীবন হবে পারমার্থিক। যদি আমাদের চিন্তা-চেতনা পবিত্র না থাকে সেই মৃত্যুর মুহূর্তে, তবে এই দেহ ত্যাগের পর আমরা অন্য একটি জড় দেহ লাভ করব। এটাই হচ্ছে প্রচলিত নিয়ম-প্রকৃতির আইন।

আমাদের বর্তমানে একটা সুন্দর দেহ রয়েছে। এই দেহ, যা আমরা এখন দেখছি তা হচ্ছে স্থূল দেহ। এটা শুধুমাত্র একটা শার্ট বা কোটের মতো। কোটের ভেতরে থাকে শার্ট এবং শার্টের ভেতরে থাকে এই দেহটি। একইভাবে শুদ্ধ আত্মা আবৃত রয়েছে একটি শার্ট এবং কোটের দ্বারা। কারখানাগুলো হচ্ছে মন, বুদ্ধি এবং মিথ্যা অহম্‌ বা অহংকার। মিথ্যা অহংকার মানে হচ্ছে- ভ্রান্ত ধারণা, আমি হচ্ছি প্রভু। আমি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা। এই ভ্রান্ত ধারণাই আমাকে এই পৃথিবীতে আবদ্ধ করে রাখে। উদাহরণস্বরূপ যেহেতু আমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছি সেহেতু আমি ভারতীয়। আমি নিজেকে একজন আমেরিকান হিসেবে চিন্তা করি, কারণ আমি আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আত্মার দিক থেকে আমি ভারতীয়ও নই, আমেরিকানও নই। আমি একটি বিশুদ্ধ আত্মা। অন্যগুলো হচ্ছে উপাধি মাত্র। আমেরিকান অথবা ইন্ডিয়ান, জার্মান অথবা ইংরেজ, বিড়াল অথবা কুকুর অথবা মৌমাছি বা বাছুর, পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক এই সবগুলোই হচ্ছে উপাধি বা আমাকে চিহ্নিত করণের উপায়। পারমার্থিক চেতনার স্তরে আমরা এই সব উপাধি থেকে মুক্ত হই। এই মুক্তি তখনই অর্জন করা যায় যখন আমরা সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সাহচর্য লাভ করি।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ শুধু আমাদেরকে কৃষ্ণের নিত্য সংস্পর্শে রাখতে আগ্রহী। কৃষ্ণ আমাদের সাথে নিত্য বন্ধুত্বের সম্পর্কে থাকতে পারেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। আর একারণেই তিনি পারেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সাহচর্যে থাকতে। তাঁর কথা এবং তাঁর নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটাই হচ্ছে সর্বশক্তিমত্তা। সর্বশক্তিমত্তা অর্থ-সবকিছুই তাঁর সাথে সম্পর্কিত তাঁর শক্তির মতো। উদাহরণস্বরূপ এই জড় জগতে যদি আমরা তৃষ্ণার্ত হই তাহলে আমরা জল চাই। এখন শুধু মাত্র জল, জল, জল, জল বলে বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেই কিন্তু আমাদের তৃষ্ণা মিটবে না। কারণ স্বয়ং জলের যে ক্ষমতা রয়েছে শুধু মাত্র এই শব্দটির তা নেই। আমাদের প্রকৃত জল বস্তুটির প্রয়োজন। তাহলেই কেবল আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। কিন্তু চিন্ময় বা পারমার্থিক জগতের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো পার্থক্য নেই। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণাবলী, কৃষ্ণের কথা-সবকিছুই কৃষ্ণ এবং একই ধরনের পরিতৃপ্তি প্রদান করে থাকে।

কিছু মানুষ যুক্তি দেখায় যে, অর্জুন কৃষ্ণের সাথে কথা বলেছিলেন। কারণ কৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত নেই। সুতরাং আমি

কিভাবে নির্দেশনা পেতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর বাণীর মাধ্যমে উপস্থিত রয়েছেন, আর তা হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ভারতবর্ষে যখন আমরা ভগবদ্‌গীতা অথবা ভাগবত নিয়ে আলোচনা করতাম, তখন আমরা প্রত্যেকদিন সেগুলোর পূজা করতাম, ফুল অথবা অন্যান্য সাজসজ্জা বা বস্তু দিয়ে, যেগুলো পূজার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। শিখ ধর্মে যদিও তাদের কোনো আনুষ্ঠানিক দেব-দেবী নেই, তারাও 'গ্রন্থসাহিব' নামক বইটির পূজা করে। সম্ভবত আপনাদের কেউ শিখ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। তাঁরা সেই গ্রন্থের পূজা করে। একইভাবে মুসলিমরা কোরআন এবং খ্রীষ্টানরা বাইবেল অর্চনা বা পূজা করে থাকে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, লর্ড যিশু খ্রীষ্ট তাঁর বাণীর মাধ্যমে উপস্থিত রয়েছেন। তেমনি কৃষ্ণও তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন।

এই সকল ব্যক্তিত্ব, ভগবান অথবা তাঁর সন্তান বা পুত্র, যাঁরা অপ্রাকৃত জগত থেকে এ জগতে অবতরণ করেন, তাঁরা এই পৃথিবীর যে কোনো জাগতিক দূষণ বা কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই তাঁদের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। এটাই তাদের সর্বশক্তিমত্ত্বা। আমরা এটা বলতে অভ্যস্ত যে ভগবান বা ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান। এই সর্বশক্তিমত্ত্বার অর্থ হচ্ছে যে তিনি তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তাঁর আনন্দ বা আমোদ-প্রমোদ অথবা তাঁর নির্দেশনা থেকে তিনি ভিন্ন নন। কাজেই ভগবদ্‌গীতার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ স্বয়ং কৃষ্ণ বা তাঁর নিজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মতোই মঙ্গলজনক।

কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে অবস্থান করছেন এবং আমার হৃদয়েও আছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। গীতা-১৮/৬১

ভগবান সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। তিনি কখনোই আমাদেরকে ছেড়ে যান না। তিনি বর্তমান। কৃষ্ণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাদের সাথে থাকেন। তিনি অপেক্ষা করে থাকেন কখন আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব। ভগবান এতই দয়ালু যে, যদিও আমরা তাঁকে ভুলে যাই, তিনি কখনোই আমাদেরকে ভুলেন না। যদিও একটি সন্তান তার পিতাকে ভুলে যেতে পারে, পিতা কিন্তু তাঁর সন্তানকে কখনোই ভুলেন না। একইভাবে ভগবান, যিনি হচ্ছেন প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি মানুষ তথা প্রতিটি জীবন্ত বিষয়ের তথা সকল কিছুর প্রকৃত পিতা। তিনি কখনো আমাদের ভুলেন না। আমাদের বিভিন্ন ধরণের শরীর থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো আমাদের পোশাকের মতো। আমাদের প্রকৃত পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাদের কিছু করার নেই। আমাদের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে আমরা শুদ্ধ আত্মা এবং এই আত্মা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই পৃথিবীতে ৮৪, ০০,০০০ প্রজাতির জীবন রয়েছে, এমনকি জীববিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীরাও তা সঠিকভাবে গণনা করতে পারেন না। কিন্তু বৈদিক ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি। এর মধ্যে মনুষ্য প্রজাতি রয়েছে ৪,০০,০০০ প্রকার এবং অন্যান্য প্রজাতি রয়েছে ৮০,০০,০০০ প্রকার। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, এ সকল প্রজাতির সকলেই হতে পারে যে কোনো পশু, মানুষ, সাপ, উপদেবতা, দেবতুল্য মানব। যাই হোক না কেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সন্তান। পিতা বীজ প্রদান করেন এবং মাতা সেই বীজ গ্রহণ করেন। এরপর মায়ের দেহ অনুসারে সেই বীজ দেহে রূপান্তরিত হয় এবং দেহ যখন পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠে তখন তা বের হয়ে আসে- হয় বিড়ালের দেহ থেকে অথবা কুকুরের দেহ থেকে নয়তো মানুষের দেহ থেকে। এটাই বংশগতির প্রক্রিয়া। পিতা বীজ প্রদান করেন এবং এই বীজ মাতৃগর্ভে দু'ধরনের ক্ষরণের সাথে মিশ্রিত হয় এবং প্রথম রাতে একটি মটর দানার মতো করে দেহ গঠিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। এই দেহে নয়টি ছিদ্র পথ থাকে যা বৃদ্ধি লাভ করে। যেমন : দু'টো কান, দু'টো চোখ, নাসিকা একটি, মুখ, একটি নাভি এবং একটি উপস্থ ও একটি পায়ু।

তার পূর্বকৃত কর্ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তি তার দেহ লাভ করে থাকে(সুখ উপভোগ করার বা দুঃখ ভোগ করার জন্য। এটাই জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়া। এই জীবন শেষ হবার পর পুনরায় তার মৃত্যু হয় এবং সে আবার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে। তখন হয়ত অন্য ধরনের একটা শরীর বের হয়ে আসে। এটাই দেহ গ্রহণের প্রক্রিয়া।

দেহ পরিবর্তন এবং বারবার জন্ম-মৃত্যুর এই প্রক্রিয়া থেকে কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি, তা জানার জন্য আমাদেরকে অধ্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী হতে হবে। এটাই মানব জীবনের বিশেষ অধিকার। বারংবার জন্ম-মৃত্যুর এই প্রক্রিয়াকে আমরা বন্ধ করতে পারি। আমরা পুনরায় আমাদের পারমার্থিক বা ঐশ্বরিক জীবন ফিরে পেতে পারি যা কিনা জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ এটাই হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমাদের এই সুযোগ হারানো উচিত নয়।

মুক্তির প্রক্রিয়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যেহেতু আমরা মাত্র শ্রবণ এবং কীর্তন শুরু করেছি। আমি এটা উল্লেখ করতে চাই যে-ভগবানের এই পবিত্র নাম- "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। জপ এবং গীতার বাণী শ্রবণ করা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকার মতোই মঙ্গলজনক। এটা "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়" উল্লেখ রয়েছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় কীর্তন এমনকি কেউ যদি ভাষা বুঝতে নাও পারে, তবে শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেও সে কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে। এই সম্পদ তাকে ধর্মীয় বা পারমার্থিক জীবনের পথে পরিচালিত করবে। সে তা বুঝতে না পারলেও এটার এমন ধরনের শক্তি রয়েছে। কৃষ্ণ সম্পর্কে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দু'ধরনের বিষয়। একটি হচ্ছে 'ভগবদ্‌গীতা'- যা কৃষ্ণ কর্তৃক গীত (বলা) হয়েছে। কৃষ্ণ সম্পর্কিত অন্য একটি বিষয় হচ্ছে "শ্রীমদ্‌ভাগবতম্"- এতে কৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং "কৃষ্ণকথা" শ্রবণের দু'ধরনের উপায় রয়েছে এবং তারা উভয়েই সমান শক্তিসম্পন্ন কারণ তারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত।

(চলবে)

ছোটদের শ্রীল প্রভুপাদ

নাচের ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল। বহু ছেলে মেয়ে মন্দিরে আসতে শুরু করল। স্বামীজির প্রচারিত তত্ত্বদর্শন শুনে, তাকে নানা প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হল; তিনি তার চমৎকার উত্তর দিলেন। নিজ শিষ্যদের তিনি কতগুলি সহজ ও সরল কাজ করতে হবে এবং যারা মন্দিরে আসবে তাদের সকলকে সেই প্রসাদ বিতরণ করতে হবে। সকালবেলা ও সন্ধ্যাবেলা সকলকে নিয়ে মন্দিরে শিষ্যদের কীর্তন করতে হবে। প্রসাদ পাওয়ার জন্য কখন কখন হাইট অ্যাসবেরী থেকে ১৫০/২০০ হিপি, উদ্ভ্রান্ত যুবক-যুবতীরা আসত। একদিন মালতী নামে একটি ভক্ত স্বামীজির কাছে একটি মূর্তি নিয়ে এল। সে এ'টি দোকান থেকে কিনেছিল যেখানে নানা আকর্ষণীয় জিনিষ বিক্রি হয়।

স্বামীজির বয়স ৭০ বছর হল তখন। তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। ১৯৬৭'র ২৫ জুলাই ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।
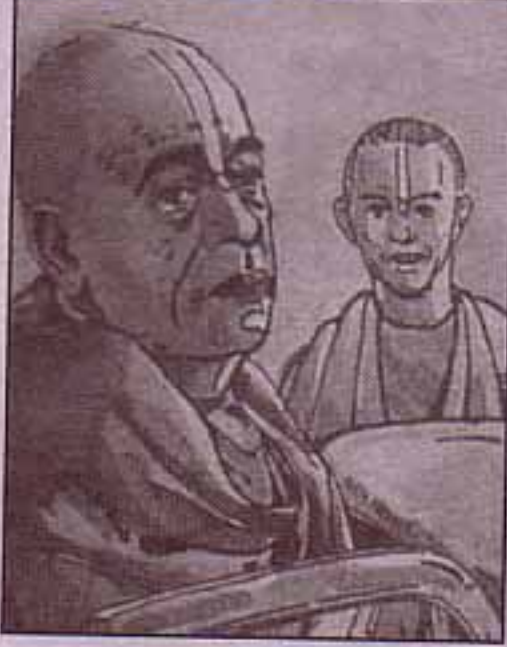
নিউ ইয়র্ক শহরে ভক্তদের সজল চোখে বিদায় সম্বর্দ্ধনাহীন দৃশ্যটি ছিল বড় বেমানান। সেখানে বিমানবন্দরে কেউই তাঁকে স্বাগত জানাতে আসেনি। একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে, পুরান দিল্লীর চিপিওয়াদায় তাঁর ঘরটিকে সোজা তিনি চলে যান।

সেখান থেকে বৃন্দাবনে রাধাদামোদর মন্দিরে তাঁর ঘরে গিয়ে উঠেন। এখানে তাঁর স্বাস্থ্যের আবার উন্নতি হয়।

ইতিমধ্যে তাঁর শিষ্যদের একটি ছোট দল সান্‌ফ্রানসিশকো থেকে লস্‌এঞ্জেলস্‌-এ গিয়ে একটি ছোট দোকান ঘরে আগের মত এক মন্দির খুলেছে। স্বামীজি সোজা লস্‌এঞ্জেলসে গেলেন। তিনি দু'মাস সেখানে থেকে ভজন-কীর্তন করলেন ও হরিকথা প্রবচন দিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃতে সদ্য দীক্ষিত ভক্তদের পরিচালনা করলেন ও তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন।

স্বামীজির অত্যন্ত ব্যস্ত অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যেও তিনি হরিকথা প্রচারে কখনও বিরত হননি। সংঘের ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাঁর শিষ্যরা সারা আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করতে লাগল।

বিট্‌ল, নামে অত্যাধুনিক গায়কদলের জর্জ হ্যারিসন'এর সঙ্গে একদল ভক্ত যোগাযোগ করে। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে জর্জ গ্রহণ করে তার কোম্পানী *Apple Record*'র অধীন সে একটি গানের রেকর্ড তৈরী করে।

জর্জ, গানের একটি এলবাম তৈরীর জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়েছিল।

প্রথমদিনই ৯০,০০০ খানা এই রেকর্ড বিক্রী হয়। হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বিপুল সাড়া জাগাল : বিপুলভাবে বেড়ে চলল।

স্বামীজিকে 'লন্ডন' -এ আমন্ত্রণ জানান হল। স্বামীজির আগমণের প্রত্যাশায় ভক্তরা বিমানবন্দরে সংকীর্ত্তন করল।

দলে দলে সাংবাদিকরা স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তিনি তখন এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তি।

বিমানবন্দর থেকে শ্রীল প্রভুপাদ সোজা জন লেনন'এর বাগান বাড়ীতে গেলেন। ভক্তরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি ঘরকে মন্দির কক্ষে পরিণত করল। সেই মন্দিরকক্ষে ব্যাসাসনও স্থাপন করা হল। এখানেই তিনি 'বিটল' গায়কদলকে স্বাগত জানান। তিনি চেয়েছিলেন তারা মনেপ্রাণে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করুক।
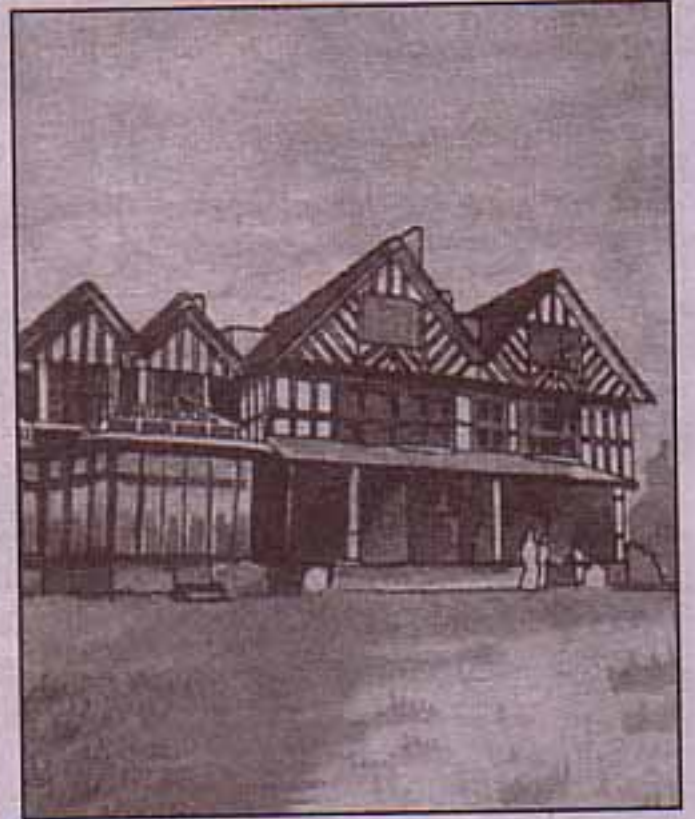
বিখ্যাত 'বিটল' গায়ক জন্, পল, জর্জ, রিংগোর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। কৃষ্ণানুশীলন করবার জন্য তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

প্রভুপাদ ও ভক্তদের জন লেনন তার বাগানবাড়ীটি ব্যবহার করতে দিয়েছিল।

স্বামীজি ৭নং বেরী প্লেসে গেলেন; এই বাড়ীটিকে ভক্তরা একটি মন্দিরে পরিণত করছিল। তাদের অর্থ খুবই কম ছিল। স্বামীজি সানন্দে তাদের সঙ্গ দান করলেন। তারা মন্দিরের জন্য শ্রীবিগ্রহ খুঁজছিল।

স্থানান্তর করবার সময় বিমানবন্দরে রাধার আঙুল সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠান দিন স্বামীজি পর্দা উন্মোচন করলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বি.বি.সি.-র দূরদর্শণের মাধ্যমে প্রচার করা হল। বিলেতের দূরদর্শণ ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রে সংরক্ষিত করা হল।

অনেক বছরের পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়িত হল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন "বিশ্বের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে।"

পশ্চিমের মানুষ এখন সফলভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করছে। বিভ্রান্ত ভারতীয় তা দেখে অবাক হবে। স্বামীজি এখন প্রভুপাদ রূপে পরিচিত এবং অক্লান্তভাবে তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ করছেন।
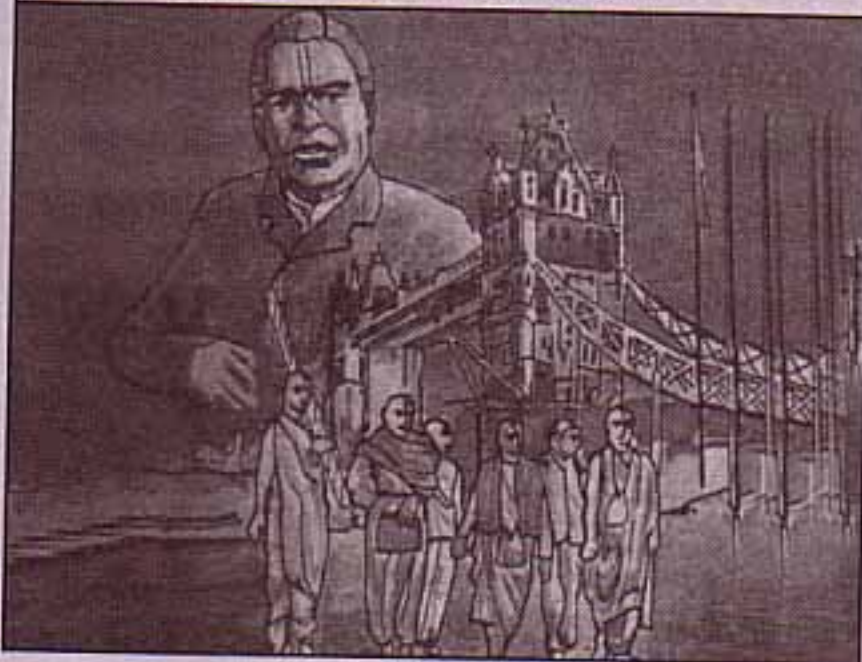
নামামৃত

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

১. ভগবানের পবিত্র নাম অতি নীচ জীবকেও উপকৃত করে :

সমস্ত চলৎ এবং চলৎবিহীন জীবিত প্রাণীই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উচ্চস্বরে ভগবানের পবিত্র নাম দ্বারা উদ্ধার হয়েছে শ্রীমন মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বললেন, এই বিশ্বে বহু জীবিত প্রাণী রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই চলৎ, আবার অন্যেরা চলৎবিহীন। গাছপালা, পোকামাকড় এবং অপরাপর জীবিত প্রাণীদের কি হবে? এরা কিভাবে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে? উত্তরে হরিদাস ঠাকুর বললেন, হে পরমেশ্বর, কেলমাত্র তোমার অহৈতুকি কৃপার দ্বারা এদের মুক্তি হতে পারে। তুমি এদের মুক্তির জন্য ইতিমধ্যেই তোমার কৃপা-বর্ষণ করেছো। তোমার দেয়া হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করলেই সব চলৎ এবং চলৎবিহীন জীব এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। চলৎ জীব এই মহামন্ত্র উচ্চস্বরে জপ করবে। আর গাছপালা এবং লতাপাতার মতো চলৎবিহীন জীবিত বস্তু এই কীর্ত্তন শুনতে পারবে। মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনিই এদেরকে বদ্ধ অবস্থান থেকে মুক্ত করবে।

২. উচ্চস্বরে ভগবানের নামকীর্তন গাছপালা, লতাপাতা, পোকামাকড় ইত্যাদিকে পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারে : শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন উচ্চস্বরে "হরিবোল" বলতেন তখন তাঁর এই অপ্রাকৃত শব্দ শুনে গাছপালা এবং লতাপাতা পর্যন্ত আনন্দে সাড়া দিতো।

উচ্চ স্বরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তনের এতই অপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে যে মানুষ এবং অপরাপর জীবজন্তুতো বটেই, এমনকি গাছপালা লতাপাতা পর্যন্ত সাড়া প্রদান করে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলতেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শুধু গাছপালা ও লতাপাতা নয়, পোকামাকড় সহ সব ধরনের জীবিত প্রাণি মাত্রকেই অহৈতুকী কৃপাদানে সমর্থ। তাই উচ্চস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনে কারো বাধা দেয়া উচিত নয়। কারণ এই মহামন্ত্র শুধু কীর্ত্তনকারীকেই নয়, শ্রবণকারী সমস্ত জীবকেই উপকৃত করে।

৩. মহামন্ত্র উচ্চ স্বরে কীর্ত্তন করে যে কেউ সমস্ত জীবিত প্রাণীকেই কৃপা করতে পারেন : শ্রীল নারদ মুনি প্রচেতাকে বলেন ঃ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে সমস্ত জীবকে কৃপা করা সম্ভব। এর মাধ্যমে যে কেউ নিজের ইন্দ্রিয়দমন করতে পারে। এসব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান, জনার্দনকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

৪. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন : রাজা চিত্রকেতুকে ভগবান সংকর্ষণদেব বললেন, চলৎ এবং চলৎবিহীন সমস্ত জীবই আমার সম্প্রসারণ মাত্র এবং আমার থেকে পৃথক। সমস্ত জীবের আমিই পরমাত্মা। আমিই ওঙ্কার এবং হরে কৃষ্ণ হরে রাম রূপে বিরাজমান। আবার আমিই পরম সত্য। আমার দুই সত্ত্বা– অপ্রাকৃত শব্দ (শব্দ ব্রহ্ম) এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এরা অভিন্ন।

৫. কৃষ্ণের নাম এবং রূপ অভিন্ন : পরমেশ্বর ভগবান হলেন পরম সত্য। এজন্য তাঁর নাম এবং রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড়জগতে কোন বস্তুর নাম এবং রূপ অভিন্ন হয় না। যেমন আম শব্দটি থেকে আম-ফলের রূপ ভিন্ন। অর্থাৎ আম আম বলে কেউ আম-ফলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে– এই মহামন্ত্র জপের সময় শুদ্ধ ভক্ত অবশ্যই অনুভব করতে পারেন যে পরমেশ্বর ভগবান তার কাছেই রয়েছেন।

৬. এই যুগে কৃষ্ণ তাঁর পবিত্র নামের মাধ্যমে অবতরণ করেছেন : পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় ব্যক্তিসত্ত্বারূপে, কখনো শব্দব্রহ্ম এবং কখনো বা ভক্তরূপে অবতরণ করেন। তাঁর অবতারের বিভিন্ন রূপ আছে। তবে এই কলিযুগে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে– এই পবিত্র নাম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে, এই কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান শব্দ ব্রহ্মরূপে অবতরণ করেছেন। শব্দ হল একটি রূপ যা পরমেশ্বর ভগবান ধারণ করতে পারেন। এই কারণেই বলা হয় কৃষ্ণ এবং তাঁর নাম অভিন্ন।

বর্তমান যুগে মানুষ ভগবানের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়েছে। তবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপী ভগবানের এই অবতার সমস্ত জীবকেই শেষ পর্যন্ত উদ্ধারে সক্ষম হবে বলা যায়।

৭. কৃষ্ণ নাম এবং তাঁর সত্ত্বার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জনৈক ব্রাহ্মণকে বলেন : ভগবানের পবিত্র নাম, তাঁর রূপ, তাঁর সত্ত্বা সবই এক ও অভিন্ন। এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এ সব কিছুই পরম সত্য। এগুলো পরমানন্দদায়ক। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিন্ময় দেহ অথবা তাঁর নাম এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বদ্ধ জীবের বেলায় দেহ এবং নামের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য আছে। এক এক জনের দেহ এক এক রকম। আবার নামের মধ্যেও প্রভেদ আছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় তাঁর চিন্ময় দেহ, চিন্ময় নাম, তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী/ ঐশ্বর্য্য এবং লীলাসমূহ – সবই অভিন্ন। এ সব কিছুই অপ্রাকৃত এবং করুণাময়।

পদ্মপুরাণে ভগবান নাদরকে বলেছেন; হে নারদ আমার ভক্ত যেখানে নাম-গান করে সেখানেই আমি অবস্থান করি। তাই জীব হল কৃষ্ণের দাস এজন্য যেখানে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে– এই অপ্রাকৃত এবং চিন্ময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের জপ অথবা সংকীর্ত্তন হয় সেখানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং সবার অগোচরে অবশ্যই উপস্থিত থাকেন।

তিলকের শোভা হবে সবার বৈভব

– শ্রী সনাতনরূপ দাস ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার জন্য দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করে থাকেন। যেটা আমরা গোপীচন্দন বলে জানি। আসলে এই গোপীচন্দন বা তিলক হলো গোপীদের দেহ। যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে গোপীকারা তাদের দেহ ত্যাগ করলে সেই গোপীকাদের দেহই গোপী চন্দনে পরিণত হয়।

পদ্মপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু তিলকের মধ্যবর্তী স্থানটিতে বিরাজ করেন। সেজন্য তিলক রেখা দুইটি মিশিয়ে ফেলা বা স্থানটি অপরিচ্ছন্ন রাখা উচিত নয়। তিলকের বামদিকে ব্রহ্মা অবস্থান করেন এবং দক্ষিণ দিকে সদাশিব বিরাজ করেন। সেইজন্য যেদেহে তিলক শোভিত থাকে সেই দেহকে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির বলে মনে করা হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন যে–

হাইকোর্টের জর্জ হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব।
তিলকের শোভা হবে সবার বৈভব ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদুক্তিতে বর্ণিত আছে যে, হে ব্রাহ্মণ! মদ্ভক্তজন স্থিরচিত্ত হয়ে সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে মদীয় অর্চ্চনা এবং হোমকালে মৎপ্রিয়ার্থ কিংবা নিজ কল্যানার্থ ও রক্ষার্থ ভয়নাশন উর্দ্ধপুণ্ড্র প্রত্যহ ধারণ করবে। এই পুরাণেই নারোদোক্তিতে বর্ণিত আছে যে, উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করে যজ্ঞ দান, তপঃ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যা করা হোক না কেন তাই বিফল হয়ে থাকে। পদ্মপুরাণের উত্তরভাগে লিখিত আছে যে, বক্ষঃস্থলাদিতে অশ্বত্থপত্রাকৃতি, বংশপত্রাকৃতি ও পদ্মকলিকাকৃতি এই ত্রিবিধ তিলক ধারণ করবে না, তা অবৈষ্ণব স্মার্ত্তসম্মত ও মোহন, অর্থাৎ অসুরমতানুসারী চক্রাচার্য্যাদি মায়াপ্রকাশ করত তাদৃশ তিলকের বিধি দিয়ে, সুতরাং ঐ ত্রিবিধ তিলক ধারণ বৈষ্ণবদের নিষিদ্ধ।

উর্দ্ধপুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রোললাটে যশ্য দৃশ্যতে।
চাণ্ডালোহপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনং॥

(স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির ললাটদেশে মৃন্ময় শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত হয়, চণ্ডাল হলেও তদীয় আত্মা পবিত্র, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে যে, হে মহাভাগে! দর্পনে কিংবা সলির গর্তে প্রতিবিম্ব দেখে যিনি যত্নসহকারে উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাঁর পরমাগতি প্রাপ্তি হয়ে থাকে। দশাঙ্গুল প্রমাণ উর্দ্ধপুণ্ড্র অত্যুত্তম, নবাঙ্গুল মধ্যম ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই তিন প্রকার উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্গলী পরিমাণে রচনা করতে হয়। নখ দ্বারা উহা স্পর্শ করতে নেই অর্থাৎ নখ দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করতে নাই। পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকৃতি, তির্য্যগ্ভাবাপন্ন, হীন খর্ব্ব, অতিদীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে লগ্ন, মূলে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অধভাগ পৃথক স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রুক্ষ, পরস্পর লগ্ন, আর যে পুণ্ড্র অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্মিত, পণ্ডিতেরা তাকে বিফল বলে নির্দেশ করেন।

তিলক রচনা বিষয়ে অঙ্গুলী নিয়ম :

স্মৃতিতে লিখিত আছে, অনামিকা অভীষ্টদাত্রী, মধ্যমা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরী, আঙ্গুষ্ট পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষপ্রদাত্রী। উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনার্থ মৃত্তিকা তুলসীমূল গিরিশিখর, নদীতট, বিল্বমূল, জলাশয়, সাগরকূল, বল্মীক, বিশেষতঃ হরি-ক্ষেত্রে, শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটগিরি, শ্রীকূর্ম্ম, কল্যাণরূপিনী দ্বারকা, প্রয়াগ নরসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র, তুলসীকানন এই সকলের যে কোন স্থল হতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকাই নারায়ণের চরনোদক সহ শরীরে পুণ্ড্র ধারণ করলে হরি সাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, অত্যুত্তম হরিক্ষেত্র হতে মৃত্তিকা গ্রহণই কর্তব্য।

গরুড়পুরাণে নারদ গরুড়কে বলেছিলেন, যিনি হস্তে দ্বারকাসঞ্জাত মৃত্তিকা নিয়ে প্রত্যহ ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড রচনা করে, তৎকৃত যাবতীয় কার্য্যের ফলই সতত কোটি গুণিত হয়ে থাকে। হে পতঙ্গরাজ ! যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত থাকে এবং যে গৃহে মানব ভক্তিসহকারে ললাটদেশে গোপীচন্দন ধারণ করেন, সেই গৃহে কংসনিসূদন শ্রীহরি শ্রদ্ধাবান হয়ে নিরন্তর অধিষ্ঠান করে থাকেন।

এভাবে সকল ভক্তের জন্য তিলক ধারণ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিধি। নিজের সুরক্ষা এবং নিজেকে শুদ্ধ রাখা উভয়ের জন্যই তিলকের আবশ্যকতা রয়েছে। আর কপালে শোভিত সুন্দর ও শুভ তিলকচিহ্ন জগতের কাছে একটি স্পষ্ট ঘোষণা রাখে : তিলক ধারণকারী ব্যক্তি একজন বিষ্ণুভক্ত-বৈষ্ণব। আর তিলক পরিহিত ভক্তকে দর্শন করে সাধারণ মানুষের কৃষ্ণ স্মরণ হয় এবং এভাবে তারাও পবিত্র হয়।

উপদেশে উপাখ্যান

হে রাম! কাম পুরাও

কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে পথেঘাটে এক ধরনের সন্ন্যাসী দেখা যায়। তারা কারও নিকট ব্যক্তিগতভাবে কিছু চায় না। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে "হে রাম! কারও মাধ্যমে আমাকে এক সের আটা দাও। হে রাম! এক পোয়া ঘি দাও।" এইভাবে ভিক্ষা করে বেড়ায়।

একদিন পশ্চিম দেশীয় এক সন্ন্যাসী পাহাড়ের নিকট বনের ধারে হাঁটতে হাঁটতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন সে চিৎকার করতে লাগল– 'হে রাম! আমাকে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে একটি মাদী ঘোড়া সে দেখতে পেল। বনের লতা ছিঁড়ে মাদী ঘোড়ার লাগাম বানিয়ে সে চড়বার জন্য ব্যস্ত হল। এমন সময় গোড়াটি একটি বাচ্চা প্রসব করল। ঘোড়াটার প্রতি আসক্তি থাকার জন্য সন্ন্যাসী তাকে ছেড়ে যেতে পারল না। এদিকে ঘোড়া তার বাচ্চাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইল না।

তখন নিরুপায় হয়ে সন্ন্যাসী বাচ্চা ঘোড়াকে কোলে নিয়ে খুব কষ্টে চলতে লাগল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাদীঘোড়াও চলতে লাগল। তখন সন্ন্যাসী বলতে লাগল– "হে রাম! তুমি এ কি দিলে? আমি চড়বার জন্য ঘোড়া চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি ঘোড়াই আমার উপর চড়ল!"

হিতোপদেশ

মায়াবদ্ধ জীবের এরূপ দশা হয়। সুখের আশায় সংসারে প্রবেশ করে। কিন্তু সংসারের বোঝা বইতে বইতে দুঃখেই তাদের জীবন যায়। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে নিজের ভোগসুখ চরিতার্থ করতে চায় না।

বনভোজন পণ্ড

দশ-বারোজন ছেলে মাঠে গিয়ে খেলা করছিল। তারা যুক্তি করল, "আজকে বনভোজন করলে খুব ভাল হয়।" ঠিক হল, তারা খিচুড়ি রান্না করবে। চাল, ডাল, নুন, লংকা, মশলাপাতি সংগ্রহ করা হলো মাঠের মাঝে উনুন বানিয়ে একটি হাঁড়িতে তারা রান্না চড়াল। শীতের দিন। হিম পড়ছে, উনুনের তাপ পোহানোর জন্য তারা উনুনের চারপাশে বসার চেষ্টা করল। নানা রকমের গল্পগুজব শুরু হল। খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেল।

এবার ভোজনের পালা। কিন্তু কলাপাতা আনা হয়নি। কলাপাতা কে আনবে, সেই ব্যাপারে একে অপরকে নির্দেশ দিতে লাগল।

একজন বলল, "আমি জ্বালানী এনেছি, অতএব পাতা আনব না।" কেউ বলল, "আমি পাতা আনতাম, কিন্তু আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ কেন? আমি যাবই না।"

শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আজেবাজে তর্ক শুরু হল। সব পণ্ড হওয়ার উপক্রম হল। বহু তর্কের মধ্যে একটি কথা জোরালোভাবে ফুটে উঠল। সেই কথাটি হল, "যে মুখ ফুটে কথা বলবে, তাকেই পাতা আনতে হবে।" কিন্তু সবাই চুপচাপ নিজ নিজ রাগ, অহংকার ও মেজাজ নিয়ে বসে পড়ল। কথা বললেই পাতা আনতেই হবে। এই ভয়ে তারা বোবার মতো বসেছিল উনুনের পাশাপাশি। খিচুড়ির হাঁড়িটা পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকে শীতের সন্ধ্যায় মাথায় কাপড় ঢেকে বসেছিল।

এমন সময় একটি কুকুর এসে খিচুড়ির হাঁড়িতে মুখ দিল। এই ঘটনা দেখেই একজন "হায় হায়" করে উঠল। কুকুরটি হাঁড়িতে মুখ দিয়েছে, অতএব আর খিচুড়ি খাওয়া হবে না। তখন তারা বোকার মতো একে অপরকে দোষ দিতে দিতে বাড়ি ফিরল।

হিতোপদেশ

ছেলেদের বোকামির জন্য বনভোজনের উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে গেল। বৃথা তর্ক, বিবাদ, রাগ এবং অহমিকা মানুষের আসল উদ্দেশ্য বিফল করে দেয়। আর অলসতাই পরিণামে দুঃখ নিয়ে আসে। আর যারা কেবল অন্যের দোষ কীর্তন করেই দিন কাটায় শেষে নিজের গুণও নষ্ট হয়ে যায়।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে আপনি গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

নিষ্পাপ আহার বিহার শয়ন

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক শরীরনিষ্ঠ বিধি, মনোনিষ্ঠ বিধি, সমাজনিষ্ঠ বিধি ও পরলোকনিষ্ঠ বিধি সবই পালন করে চলবেন। যেমন, ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে দৈহিক সংস্কার– শৌচস্নানাদি সম্পাদন করবেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ পূর্বক পারমার্থিক ও ঐহিক সমস্ত কর্ম– দিবারাত্র মধ্যে কখন কোনটি সম্পাদন করবেন তা স্থির করবেন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিশ্রম করতে হয়। উপযুক্ত সময়ে ভোজন করতে হয়। গর্ভবতী নারী, আশ্রিত জন, বৃদ্ধ, শিশুদের আগে ভোজন করিয়ে নিজে ভোজনে বসবেন। অসময়ে ভোজন ভাল নয়। শরীরনিষ্ঠ বিধি বলতে বুঝায় শরীর সুস্থ রাখার পদ্ধতি। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, স্বচ্ছ জলপান, পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান, তিনপ্রহরের অনধিক নিদ্রা ইত্যাদি শারীরিক বিধিপালন করা প্রতিদিনই কর্তব্য।

আমাদের বর্তমান সমাজে দেখা যায়, মানুষ গাধার মতো খাটছে অর্থ উপার্জনের জন্য। বিড়ি, তামাক, গাঁজা, চা, দোক্তা, খৈনি, ইত্যাদি নোংরা ক্ষতিকর দ্রব্য খাচ্ছে, আর শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে অর্থ উপার্জনের জন্য শ্রম দিচ্ছে। অনেক সময় তারা এমন ব্যস্ত থাকে যে, তারা উপযুক্ত সময়ে স্নানাহার সম্পাদনের সুযোগ পায় না।

সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাসমূহ আলোচনার মাধ্যমে মানুষের প্রতিদিনকার মন সুস্থ থাকে। কমপক্ষে দিবসের শেষে গীতা-ভাগবত আলোচনা হরিনাম কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে মন সুস্থ থাকে। কিন্তু মনোনিষ্ঠ বিধি পালন করতে অনেকেরই সময় থাকে না, কেননা তারা কেবল আর্থিক রোজগারকেই সবচেয়ে বড় কর্ম বলে জ্ঞান করে থাকে। আর্থিক রোজগার হলেই মানুষ মনে করে যে তারা সুখী হবে। কিন্তু সেই অর্থই মনের মধ্যে অনর্থের বীজ বপন করে থাকে। যেমন – মিথ্যা দম্ভ, গর্ব, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।

আবার যাদের সময় আছে, তারা সন্ধ্যা থেকেই আধুনিক সিনেমা, কিংবা তাস জুয়াতে মনোনিবেশ করে থাকে। তাতে তারা মানসিক সুখ আহরণ করলেও সেই সুখানুভূতি ক্রমশ নেশাগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে আসে এবং চেতনাকে অধোমুখী করে তোলে।

যখন মানুষের অর্থের পুঁজি বর্ধিত হয়, তখন তার যদি পারমার্থিক কল্যাণের দিকে মনের প্রবণতা না থাকে তবে সে সমাজে ঈর্ষার পাত্র ও ঘৃণার্হ হয়ে থাকে। পরিণামে মৃত্যুকালে সবকিছু বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়ে তাকে অসদ্‌গতি লাভের জন্য চলে যেতে হয়। এভাবে শরীর, মন, সমাজ ও পরলোক সমস্ত বিধিনিষ্ঠা লংঘনকারীর জন্য নারকীয় যাতনাই ভাগ্যলিপি হয়ে থাকে।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে ন্যায়সঙ্গত ধন উপার্জন, যথাসাধ্য সংসার প্রতিপালন, প্রয়োজনমতো সামাজিক ক্রিয়া সাধন, জগতের উন্নতির কাজে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদির মাধ্যমে জীবনের সদ্‌গতিবিধি রক্ষা করে চলতে হয়।

তিনপ্রহরের অধিক নিদ্রা গ্রহণ করা অনুচিত। স্নান, আহার, নিদ্রা সুস্থ ও নিষ্পাপভাবে সম্পাদন করতে হয়। স্বচ্ছ জলে স্নান, পবিত্র বস্তু আহার এবং নিদ্রাকালে সুষ্ঠুনিদ্রা আবশ্যক। আহার ও নিদ্রাকালে ভগবানের নাম স্মরণ কর্তব্য। আহার কালে কলহ, নিদ্রা কালে অবৈধ সঙ্গ, অপবিত্র ও কীটযুক্ত শয্যা অকল্যাণকর।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

মহর্ষি মনু গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য বহু কর্তব্য কর্মের বা ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে এই যজ্ঞানুষ্ঠান প্রত্যেক দিন গৃহস্থগণ পালন করে চলতেন। গৃহস্থ ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গৃহস্থালীর কাজে উনুন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, মুষল, কলসী প্রভৃতির ব্যবহারে বহু কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ হয়। এই সব স্থানে যে পাপ হয়, তা স্খলনের উদ্দেশ্যে পাঁচটি যজ্ঞ বিধেয়। ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ।

যে গৃহস্থের গৃহে গীতা, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ রক্ষিত আছে এবং নিত্য কিছু কিছু পাঠ করা হয়, সেই অধ্যয়ন অধ্যাপনাই হল ঋষিযজ্ঞ।

তাঁরা স্নানকালে অঞ্জলি করে জল নিবেদন মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতেন। তাতেই পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করতেন। এটিই পিতৃযজ্ঞ। সামর্থ্য থাকলে অন্ন, দুধ, ফলমুল দ্বারা যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হত। অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভোজন করানো হত।

রান্নাকালে দেবতাদের সন্তোষবিধান ও বিশেষত অগ্নিদেবাদির তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটু ঘি অগ্নিতে প্রদান করা হয়, সেটি-ই দেবযজ্ঞ। অনেকেই বৈশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে হোম করতেন। তাতে কুকুর, কাক, কীটাদি, পতিত ব্যক্তি প্রভৃতির জন্য ভূতলে অন্ন বিতরণ করা হত। অন্ন এমনভাবে মাটিতে দেওয়া হত যাতে ধুলো লাগত না। আর কুকুরাদি পশুপক্ষীরা সেগুলি খেয়ে নিত। এটিই ভূতযজ্ঞ।

গৃহস্থ ব্যক্তি আগন্তুক কোন অতিথি, ভিক্ষুক, বা ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দান করতেন। সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথি সৎকার করতেন। এমন কি অতি দরিদ্র গৃহস্থও কমপক্ষে প্রিয় শ্রদ্ধান্বিত বাক্যদ্বারা অতিথি সেবা সম্পাদন করতেন। এটিই নৃযজ্ঞ।

অতিথিকে না খাইয়ে গৃহস্থ ব্যক্তির নিজের ভোজন করা কর্তব্য নয়। অতিথি সেবার ফলেই গৃহস্থের সমৃদ্ধি যশ আয়ু ও পরকালে শান্তি সমৃদ্ধি লাভ হয়। গৃহে উপস্থিত বন্ধু সহপাঠী, গ্রামবাসী, জ্ঞাতি বা গুরু অতিথি পদবাচ্য নন। আবার যে গৃহস্থ পরের অন্ন ভোজনের দোষ না জেনে কেবলমাত্র আতিথ্যের লোভে অন্ন ভোজন করে বেড়ায়, তারা অতিথি নয়, তারা পাপী বলে মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে।

ভোজনের আশায় যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে নিজের কুল গোত্রাদি উল্লেখ করেন তিনি নিন্দনীয় হন।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ঃ ১। আমরা গৃহস্থ মানুষ। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। মাছ-মাংস না খেলে চলবে কি করে?

-সমীর হালদার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা

উত্তর ঃ গৃহস্থ ব্যক্তিদের যেহেতু আপন ছেলেপিলেদের প্রতি দয়া-সহানুভূতি, মায়া-মমতা রয়েছে, সেহেতু তাঁদের সর্বাগ্রেই অন্য প্রাণীদের প্রতিও মায়া-মমতা থাকা প্রয়োজন। যথার্থ ভক্ত-গৃহস্থ কখনই অন্যপ্রাণীর রক্ত-মাংস-হাড় ভক্ষণের প্রতি রুচিশীল হন না।

শ্রীব্রহ্মাপুত্র কর্দম মুনিকে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালেই পরমেশ্বর ভগবান গৃহস্থ জীবনের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/১১/৩১)–" সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর এবং সকলকে অভয় প্রদান করে আত্ম-উপলব্ধি কর।" সুতরাং, জগতে অন্য সকল জীবের প্রতি অনুকম্পা না থাকলে, অন্যের বেঁচে থাকার মতো নিরাপত্তার আশা না দিতে পারলে এই জগতে গৃহ বানিয়ে গৃহস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ বৈদিক আইনে তার জীবনেও কোনও অনুকম্পা বা নিরাপত্তা লাভের সুযোগ থাকে না।

একজন আদর্শ গৃহস্থ পিতা-মাতার কাছে কেবল নিজেদের জাত সন্তানই নয়, অন্যের গর্ভজাত জীবও সন্তানের মতো। সেই কথা গঙ্গাপুত্র শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন (মহাভারত ১১৪-১১৫ অঃ) "যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হয়ে পুত্রমাংস-তুল্য অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সে অত্যন্ত নিম্নজাত বলে পরিগণিত হয়। তাকে বহুবিধ পাপযোনিতে জন্ম নিতে হবে। পরের শরীরের মাংস ভক্ষণ করে আপন শরীরের মাংস পুষ্ট করতে যে ইচ্ছা করে, তাকে প্রত্যেক জন্মেই উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল যাপন করতে হয়। তাই আত্মকল্যাণকারীর পক্ষে অবশ্যই মাছ-মাংসাদি ভক্ষণে বিরত হওয়াই শ্রেয়।

প্রশ্নানুসারে, মাছ-মাংস না খেয়েই অনেক গুণ ভালভাবেই চলবে। মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ মশলাপাতি ও তেল খরচ হয় তার চেয়ে অনেক কম খরচেই বেদবিহিত শাক-সবজি গ্রহণ করে একই শক্তি অর্জন করে সুস্থ সবলভাবে বাঁচা যায় এবং তাই-ই মঙ্গলকর।

প্রশ্ন-২। পাপাচারী মানুষের মৃত্যুর পর নরকগতি হয়, তারপর নরকশাস্তি ভোগের পর কোথায় যায়?

–চন্দ্রশেখর দেব, ষাটনল, চাঁদপুর।

উত্তর : পাপকর্মের ফলে নরক গতি হয়। নরক যাতনা ভোগ করার পর আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। এমন কখনই মনে করা উচিত নয় যে, পাপকর্মের সম্পূর্ণ শাস্তি ভোগ হয়ে যাওয়ার পর জীব মুক্ত অবস্থা লাভ করে। না, বরং সম্পূর্ণ শাস্তি না ভোগ করিয়ে অবশিষ্ট শাস্তি লাভের জন্য নরকে যাতনা-শরীর ত্যাগ করে জীবকে আবার মর্ত্যলোকে যে-কোন শরীর লাভ করে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কোন্ ধরনের পাপকর্মীর কি জন্ম লাভ হয় সেই কথাও মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিবৃত হয়েছে।

যারা পতিত ব্যক্তির যাজন করে তারা নরকমুক্তির পর কৃমি হয়। আচার্যের প্রতি কপট ব্যবহারকারীরা কুকুর জন্ম লাভ করে। আচার্যের দ্রব্যের ভোগবাঞ্ছা, পিতামাতার অবমাননা যারা করে, তাদের গর্দভ যোনি লাভ হয়। যে ভ্রাতৃভার্যাকে অপমানিত করে সেই পাপী পুংস্কোকিল জন্ম পায়। পরস্ত্রী হরণকারীর কুকুর, শেয়াল, শকুন জন্ম হয়। যারা ধান, সরিষা, ছোলা ইত্যাদি শস্য হরণ করে তাদের ইঁদুর জন্ম পেতে হয়। যারা বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নীকে কামার্ত হয়ে ধর্ষণ করে তারা শূকর হয়ে জন্মায়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণকে নিবেদন না করে যারা ভোজন করে তারা কাক জন্ম পায়। দান ও বিবাহে যারা বিঘ্ন করে তাদের কৃমি জন্ম পেতে হয়। যারা অন্যায় ভাবে জমি দখল করে তাদের বৃক্ষ জন্ম পেতে হয়।

এইভাবে বিভিন্ন পাপকর্মের স্বরূপ বিভিন্ন রকমের যোনি ভ্রমণ করার পর ক্রমে ক্রমে আবার মানুষ জন্ম লাভ হয়।

প্রশ্ন ৩। আমরা কিভাবে বুঝব কোন মানুষ স্বর্গ থেকে, কোন মানুষ নরক থেকে এসে এই পৃথিবীতে মানুষ জন্ম লাভ করেছে? – **শান্তা কুণ্ডু, রসুলপুর, দেবিদ্বার,** কুমিল্লা।

উত্তর : মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে যদি কোন মানুষকে দেখা যায় যে, সে পরনিন্দা করে বেড়াচ্ছে, পর-উৎপীড়ন করে চলেছে যে কৃতঘ্ন, পরস্ত্রী হরণ, পরদ্রব্য হরণ, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, বৈদিক আচার মানে না, দেব-দেবতাদের অবজ্ঞা করে, লোকের সঙ্গে প্রতারণা, মানুষকে খুন করতেও যার কুণ্ঠা নেই, যে কাউকে কিছু দান করতেও চায় না, লোকের সঙ্গে প্রতারণায় উন্মুখ, এইভাবে যে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কর্ম করছে কিংবা এই সব কাজেই যার প্রবৃত্তি, তখন বুঝতে হবে নরক ভোগের পরই সে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

আর যদি কাউকে দেখা যায়, সে সর্ব জীবের প্রতি দয়া, সৎবাক্য কথন, পুন্যকর্মে আগ্রহী, সকলের মঙ্গলের জন্য সৎবাক্য প্রয়োগ, বেদ শিক্ষায় অনুগামী, গুরু, দেব-ঋষিগণের পূজা, সাধুসঙ্গ, সকলের প্রতি মৈত্রী, এইভাবে বিভিন্ন মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্ত, তখন বুঝতে হবে স্বর্গভোগের পরই সে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

প্রশ্ন-৪। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন?

– পার্বতী সাহা, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে দুঃখময় সংসার-বদ্ধ জীব জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করে গোলোক বৃন্দাবন নামক সর্বোচ্চ ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি ভক্তদের বলেছেন–

"যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥
কি শরনে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণনাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সবার শরীরে ॥"

ব্রহ্মা শিব শুকদেব গোস্বামী প্রমুখ মহান মহাজনেরা যে ভক্তিরস লাভের জন্য বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করেন, এই ধন্য কলিযুগে পাপাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষ অতি সহজেই তার জীবনের মাত্র কয়েকটি বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্তন, কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ, কৃষ্ণ প্রসাদ সেবন, কৃষ্ণ বিগ্রহ অর্চনাদির মাধ্যমেই সেই পরম ফল লাভ করতে পারবে।

প্রশ্ন-৫। কিভাবে দুঃখ নিবারণ সম্ভব হয়?

–সুপ্রিয়া দে, ভোলা।

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রীতিবিনা এই দুঃখসময় সংসারে দুঃখ নিবারণ সম্ভব নয়। মানুষ যখন শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে চিন্তা, কর্ম, আচরণ করে তখন পরিণামে সেই চিন্তা সেই কর্ম সেই আচরণ তার জন্য এই জড় জগতে শোক দুঃখ নিয়ে আসে। কিন্তু সেই চিন্তা, সেই কর্ম কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হলে পরিণামে তার অন্তহীন অনাবিল আনন্দ লাভ হয়।

প্রশ্ন-৬। পরমেশ্বর ভগবানের জন্ম-মৃত্যু নেই। তা হলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মৃত্যু লীলার তাৎপর্য কি? ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হল কেন?

– নয়নরায়, হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদ।

উত্তর : ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতিশ্রুতি, ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বিচিত্র অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করে থাকেন। বহু জন্ম কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করার বাসনা পূরণ করতে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মলীলা প্রকাশ করলেন। শাম্ব ইত্যাদি কৃষ্ণের বংশধরদের মুনিঋষিগণ একবার অভিশাপ দিয়েছিলেন লৌহমুসল দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হবে। সেই অভিশাপ সত্য করার জন্য কৃষ্ণ যেহেতু মহাত্মা যদুর বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই তিনিও সেই লোহ অংশ দ্বারা নির্মিত বাণের আঘাতে মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন। আর ব্যাধটি ছিল পুর্বকালে বালীপুত্র অঙ্গদ। রামের বাণের আঘাতে বালী বধ হলেও অঙ্গদ রামের ভক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বলেছিলেন পরবর্তীতে অঙ্গদের বাণের আঘাতে তিনি মৃত্যু বরন করবেন। কৃষ্ণলীলায় তাই ব্যাধের বানের আঘাতে কৃষ্ণ অপ্রকটলীলা করলেন।

প্রশ্ন ৫। জগৎ সংসারে হাজার রকমের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এ সমস্ত উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য কি?

– সমীর চন্দ্র দেব, গোপলগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণত সমস্ত মঙ্গলময় উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হচ্ছে শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করা। সাধারণত উৎসব বলতে ব্রত-পূজা, আরাধনা, নৃত্যগীত, বাদ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে বোঝায়। কিন্তু অবৈদিক সভ্যতায় উৎসব অনুষ্ঠান তামসিক আচারে পরিণত হচ্ছে বলে হরিতোষণ বরবাদ করে লোকে ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভক্তিবিরুদ্ধ গীতবাদ্য উল্লাসে মত্ত হয়ে থাকে। কিভাবে উৎসবে মানুষের নিমগ্ন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন–

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্মাণ্যাভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥

"আমার চরিতকথা বিষয়ক গান, আমার নাম কীর্তন, আমার কথা অন্যের কাছে বর্ণন, আমার মহিমা শ্রবণ, আমার ক্রিয়াকলাপ অভিনয় এবং নৃত্য করে উৎসব-মগ্ন হবে।ঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/২৭/৪৪)

সনাতন বৈদিক ধারায় প্রতিটি উৎসবের কেন্দ্রে শ্রীহরিই আরাধিত হয়ে থাকেন। কি দুর্গাপূজা, কি বিবাহ অনুষ্ঠান, কি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান– সব উৎসবেই শ্রীহরির শিলা-বিগ্রহ (নারায়ণ শিলা) সর্বাগ্রে পূজিত হন। আর সেই শ্রীহরির স্তব-স্তুতি, প্রণতি নিবেদন, প্রার্থনা নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্বিক মঙ্গল সাধন বিশেষত পারমার্থিক মঙ্গল সাধনই উৎসবের লক্ষ্য।

কিন্তু বর্তমান অবৈদিক মানব সমাজে ডাক ঢোল বাজিয়ে, অশ্লীল গানের রেকর্ড চালিয়ে, হৈ হৈ করে অপ্রসাদ ভক্ষণ করে, কোথাও বা নেশাভাঙ করে সমগ্র উৎসব অনুষ্ঠান নিদারুণভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। যার ফলে মানুষের মঙ্গলও সুদূরপরাহত।

প্রশ্ন ৭। জীবহত্যা মাত্রই যদি পাপ হয়, তবে ভক্তরা গাছকে হত্যা করে পাপ করেন কেন? গাছেরও তো প্রাণ আছে?

– প্রদীপ সাহা, অভয়নগর, যশোহর।

উত্তর : কতকগুলি বিষয়ে বেদশাস্ত্রে নির্দেশ আছে যেখানে হত্যা করলেও কোনও পাপ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ বিপক্ষ শত্রুসৈন্যকে হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নির্দেশ দিচ্ছেন বিপক্ষ যোদ্ধাদের হত্যা করতে। সেখানে হত্যা করাটা পাপ নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের নির্দেশ অমান্য করাটাই মহাপাপ। গাছকেও অনর্থক হত্যা করা উচিত নয়। তবে ভক্তরা যে ভগবানের মন্দির, আসন, ভোজদ্রব্য ইত্যাদির আয়োজন করতে গাছকে ছেদন করছে– এতে পাপ হচ্ছে বলে কখনও কোথাও নির্দেশ করা হয়নি। অধিকন্তু, ফল ফুল লতা পাতা শাখা প্রশাখা দিয়ে ভগবানের ভোজদ্রব্য তৈরি করা, মন্দির সাজানো, ভগবানকে নিবেদন করা, ভগবদ্‌প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পুত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিপুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। (গীতা ৯/২৬) স্রষ্টার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হওয়াটা যথার্থ কর্ম। মাছ মাংস ডিম খেতে ভগবান মানুষদের নির্দেশ দেননি, শস্য ফল মূল শাকসজী তাঁরা প্রসাদরূপে ভোজন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাক্ষস, পিশাচ, ডাইনিরা যদি মাছ মাংস ডিম খায়, তবে তাদের পাপ হয় না, কারণ তাদের জন্য শাস্ত্রে সেগুলি খাওয়ার বিধান রয়েছে। যক্ষ-রক্ষাংসি ভূতানি পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/১৮/২১) যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচরাই মাছ-মাংস খায়।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য এই যে, জীব মাত্রেই হত্যা করা মহাপাপ নয়। বেদশাস্ত্রে ছয় প্রকার মানুষকে হত্যা করলেও কোন পাপ হয় না বলে নির্দেশ করা হয়েছে– ১) যে বিষ প্রয়োগ করে, ২) যে ঘরে আগুন লাগায়, ৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, ৪) যে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, ৫) যে অন্যায়ভাবে জমি দখল করে, এবং ৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে। এই ধরনের শত্রুদের অভিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং এদের হত্যা করলে কোনও পাপ হয় না। (গীঃ ১/৩৬ ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

আবার, রক্তমাংসের লালসায় প্রাণীহত্যা যে করছে কেবল তারই পাপ হচ্ছে, এরূপ নয়; অধিকন্তু সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষই সেই পাপে জড়িত হয়ে সমানভাবে দণ্ডনীয় হয় বলে শাস্ত্রে বলা হয়েছে; যথা– ১) যে বিক্রি করে, ২) যে কেনে, ৩) যে কাটে, ৪) যে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়, ৫) যে রান্না করে, ৬) যে পরিবেশন করে, এবং ৭) যে ভক্ষণ কর। (মনুসংহিতা ৫/৫১) [বাকী অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সম্পাদকীয়

একমাত্র ভরসা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ দুটি উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্– সরলপ্রাণ ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অশিক্ষিত অসভ্য অসুর, যারা অনর্থক কুকুরের মতো চিৎকার করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের সংহার করার জন্য। বলা হয়েছে, কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। হরেকৃষ্ণ আন্দোলনও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। আসুরিক রাজা এবং রাজনীতিবিদ্‌দের ভয়ে আমাদের যারা ভীত, তাদের অবশ্য কর্তব্য নামরূপে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে– শ্রীকৃষ্ণের এই অবতারকে স্বাগত জানানো। তা হলে আমরা আসুরিক শাসকদের উৎপীড়ন থেকে অবশ্যই রক্ষা পাব। বর্তমান সময়ে এই সমস্ত শাসকেরা এতই শক্তিশালী যে, তারা যেন-তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বা আপৎকালীন অবস্থার অজুহাতে অসংখ্য মানুষকে নির্যাতন করে। তারপর এক অসুর অন্য অনসুরকে পরাস্ত করে, কিন্তু জনসাধারণের দুঃখের ভার লাঘব হয় না। তাই সারা পৃথিবী আজ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে, এবং এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র ভরসা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন। প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তাঁর আসুরিক পিতার দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তখন ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রকার আসুরিক পিতা বা শাসক রাজনীতিবিদ্‌দের কারণে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রসার অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এখনই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র নামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা আশা করতে পারি যে, এই সমস্ত আসুরিক পিতাদের বিনাশ হবে এবং সারা পৃথিবী জড়ে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সারা পৃথিবী আজ রাজনীতিবিদ্ গুরু, সাধু, যোগী এবং অবতারের বেশে অসংখ্য অসুরে পূর্ণ, এবং তারা মানব-সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করতে সক্ষম কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এখানে কংসকে অসভ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ সে তাঁর ভগ্নীর সন্তানদের হত্যা করেছিল। দেবকীর অষ্টম সন্তানের দ্বারা তার মৃত্যু হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অসভ্য কংস তার অবলা ভগ্নীকে তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য যে কোন কার্য করতে পারে। সে শিশুদের হত্যা করতে পারে, গোহত্যা করতে পারে, ব্রাহ্মণদের হত্যা করতে পারে, বৃদ্ধদের হত্যা করতে পারে, কারও প্রতি তার দয়া নেই। বৈদিক সভ্যতায় গাভী, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের দোষী হলেও ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু অসভ্য অসুরেরা তা মানে না। বর্তমান সময়ে, নির্বিচারে গাভী এবং শিশু হত্যা করা হচ্ছে, এবং এই সভ্যতা মোটেই আর মানুষের সভ্যতা নয়, এবং যারা এই নিন্দনীয় সভ্যতা পরিচালনা করছে, তারা হচ্ছে অসভ্য অসুর।

এই প্রকার অসভ্য মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুকূল নয়। জনসাধারণের নেতারূপে তারা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করে যে, হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কীর্তন হচ্ছে একটি উৎপাত স্বরূপ, যদিও ভগবদ্‌গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, মহাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। দুর্ভাগ্যবশত, মানব-সমাজ আজ এক এমনই অসভ্য স্তরে উপনীত হয়েছে যে, তথাকথিত মহাত্মারা গাভী এবং শিশু হত্যা করেছে এবং হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রকার অসভ্য কার্যকলাপ বোম্বাইয়ে হরেকৃষ্ণ ল্যান্ডে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল। কংস যেমন বসুদেব এবং দেবকীর সুন্দর শিশুটিকে হত্যা করবে বলে আশা করা যায়নি, তেমনই আধুনিক সমাজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতিতে অসুখী হলেও তাকে বাধা দিতে পারবে না। তবুও আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও হত্যা করা যায় না, তবুও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব স্নেহবশত ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, কংস এক্ষুণি এসে তাঁর পুত্রকে হত্যা করবে। তেমনই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদিও শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন এবং কোন অসুরই তা বাধা দিতে পারে না, তবুও অসুরেরা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দিতে পারে বলে মনে করে আমরা ভীত হই।

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে।। (ভ:র:সি: ১/২/১৮৭)

অনুবাদ: যিনি তাঁর দেহ, মন ও বাক্য দিয়ে ভগবান শ্রীহরির দিব্য সেবায় নিযুক্ত আছেন, তিনি এই জড় জগতে থাকা কালেও সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত থাকেন। তাঁকে জীবন্মুক্ত বলা হয়।